১১৩৫

বিপত্নীক।

বিপত্নীক

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

হেয়ার প্রেস—কলিকাতা।

১৩০৯

কলিকাতা, ৪৬নং, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, হেয়ার প্রেসে
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত।

উপক্রমণিকা

উষা।

উপক্রমণিকা।

নদীতীরে।

"শরৎ, আমার মনে হইতেছে, আমি এ বিবাহ না করিলেই ভাল হয়। তুমি বিবাহ কর।"

সম্মুখে কলনাদিনী জাহ্নবী; সন্ধ্যার মৃদুপবনে আবিল জলরাশিতে মৃদু মৃদু তরঙ্গ উঠিতেছে; সেই তরঙ্গে নদীবক্ষে বহুদূর পর্য্যন্ত তরণীশ্রেণী কাঁপিতেছে; মধ্যে মধ্যে দুই এক-খানা বাষ্পীয়পোত কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশিতে গগনে নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার-লোক সৃষ্টি করিয়া, জল-বক্ষ বিলোড়িত করিয়া যাইতেছে। গঙ্গার পরপারে বৃক্ষরাজি ও সৌধমালা ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। পশ্চাতে অগণিত সৌধরাশিখচিত কলিকাতা নগরী ধূলি, ধূম এবং অন্ধকারে আচ্ছন্নপ্রায়।

যে দুই জন যুবক গঙ্গাতীরে বসিয়া আছে, তাহাদিগের হৃদয় সেই সান্ধ্য আকাশের সহিত তুলনীয়; সূর্য্যাস্তের সময় মেঘমালা যেমন নানা ছবি গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে, তাহা-দিগের হৃদয়েও তেমনই নানা ভাব প্রদীপ্ত হইতেছে ও নির্ব্বাপিত হইতেছে—উভয়েরই হৃদয়ে লোহিতাভ আকাশে অন্ধকারের মত চিন্তার ছায়া। উভয়েই অল্পবয়স্ক, বয়স বিংশতি বা একবিংশতি বৎসর হইবে।

আর একজন বলিল, "প্রবোধ, রজনীর শিশির যেমন কুসুমকোরকে পতিত হইয়া তাহাকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করে, তাহাকে বিকশিত করে, তেমনই আশা নবীন বাসনাকে রক্ষা করে, বর্দ্ধিত করে। কেন হতাশার কথা কহিতেছ ?"

প্রথম বক্তা উত্তরে বলিল, "না, তুমিই কর।"

"তুমি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারিতেছ না; সরোবরের স্বচ্ছ সলিলতলে মৃণালের মূল আবদ্ধ থাকে, তবে পবন প্রবাহিত হইলে জলের উপর তাহার ফুল আন্দোলিত হয়। এ বিবাহে তোমার ইচ্ছা আছে; তুমি আপনিই তাহা বুঝিতে পারিতেছ। তবে কেন সন্দেহদোলায় দুলিতেছ ? তুমি বিবাহ কর।"

"আমার মতামতের কারণ আমি তোমাকে বলিয়াছি; বুঝিয়া দেখ। না ভাই, তুমি বিবাহ কর।"

"অবোধের মত কথা বলিতেছ কেন ? তুমি বিবাহ কর।"

যাহাকে ইহা বলা হইল, সে ঈষৎ হাসিল—যেন একটু মেঘ স গলে মেঘভরা আকাশে সূর্য্যালোক হাসিল। সে বলিল, যই ! আমি বিবাহ করি, আর তুমি কাঁদিয়া বালিশ ভিজ আর ভিজা বালিশ মাথায় দিয়া অসুখ বাধাও; তাহ আবার তোমার শ্লেষ্মার ধাত !"

" হাসির বটে, সুযোগ পাইয়া আমাকে লইয়া

তুমি বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়া লইলে; কিন্তু আমি ত তেমন করিয়া হাসিতে পারি না! আমার অবস্থাটা এখন মাঝামাঝি এক রকমের—এদিকও নহে, ওদিকও নহে; যেমন,—

'আউষও নয় আমনও নয় কার্ত্তিকমেসে ঝাঁটি,
বেলেও নয়, আটালও নয় দোআঁশ মাটি।'

তোমাকে এ কথাটা বুঝাইতে যে এত করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝি নাই। হইতে পারে, তুমি কোনও বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বিবাহ না করিতে পারি। কিন্তু আমি ত তোমাকে বলিয়াছি, এ ক্ষেত্রে ব্যাপার তাহা নহে।"

"আমি জানি, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া তোমার ব্যবসায় নহে, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি। ভাল কথা, তুমি ও ছড়াগুলা কোথা হইতে সংগ্রহ কর, বল দেখি?"

"তুমি সেক্সপিয়ার, বায়রণ, শেলী, টেনিসনের কোমলকান্ত পদাবলি পাও কোথায়? গ্রামের ফকির ভিক্ষা পায় না।"

"তোমার ঐ কথা। তোমার প্রচুর রচনাক্ষমতা আছে; তুমি বাঙ্গালা লিখিয়া সেটা নষ্ট করিতেছ। [illegible] ভাষাটা কি টিঁকিবে?"

"সকল বাঙ্গালী তোমার মত হই[illegible] [illegible]ষাটার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিত [illegible]। ভাই, সবাই তোমার মত নহে। বিদেশী রচনা যতই [illegible]উৎকৃষ্ট, আমা-

দিগের নিকট তত প্রাণস্পর্শী হয় না, 'কলের পুতুল হয় কি মানুষ, তুল্লে উঁচু করে'? দেশকালপাত্র হইতে বহু উচ্চে উঠিয়া কিছু রচনা করা সকলের ক্ষমতায় সম্ভব নহে।"

"যাক্, কথাগুলা বক্তৃতার মত শুনাইয়া আসিতেছে। ও সম্বন্ধে তোমার সহিত আমার কোনও কালে মতের ঐক্য হইবে না।"

"সেই ভাল, মিছামিছি বকাবকি করিয়া সন্ধ্যার শান্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া কাজ নাই। এখন বল ত লুচিটা কবে জুটিবে?"

"লুচি ত জুটিবে; এখন আমার কথা, তুমি কিন্তু নিতবর।"

"শেষ বর চেনা দায় হইবে!"

দুই জনেই হাসিল।

উঠিয়া উভয়ে গৃহাভিমুখ হইল। কিন্তু দুই জনেই কি ভাবিতে ভাবিতে গেল; যে জনতার মধ্য দিয়া তাহারা গমন করিল, কেহই সে জনতার কিছু লক্ষ্য করিল না। একটা চৌরাস্তায় আসিয়া দুই জনে বিদায় লইল। উভয়ে নিজ নিজ গৃহে গেল।

প্রথম খণ্ড

প্রভাত।

ৰিপত্নীক।

অভাব শৈশবের শিক্ষার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। শরৎ সংসারের সুখদুঃখ নীরবে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল; বিশেষ, স্বভাবতঃই সে কিছু চাপা। সুখে দুঃখে তাহার সঙ্গী সাহিত্যসেবা। সে সদালাপী বন্ধু হইলেও সকলের সহিত তাহার তেমন মিশামিশি ছিল না। এক একখানা জটিল ভিন্নদেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তক লইয়া সে সমস্ত রজনী যাপন করিতে পারিত; কিন্তু পাঁচ জন অপরিচিত লোকের সহিত কিছুক্ষণ বসিয়া আলাপ করিতে তাহার বিরক্তিবোধ হইত। আবশ্যক হইলে সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যাইতে ও মিশিতে পারিত; কিন্তু আবশ্যক না হইলে সে কিছু মুখচোরা। কাহাকেও তিরস্কার করিতে সে নিতান্ত সঙ্কুচিত। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে সে সামাজিক আচারব্যবহার পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। কবিতা রোগটা নিতান্ত অল্পবয়স হইতেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ এই সকল জানিয়া, সামাজিক যে সকল কার্য্যে লোকের সহিত মেশা প্রয়োজন. সে সকল কার্য্য আপনিই সম্পন্ন করিতেন।

বন্ধুত্বের ছায়াস্নিগ্ধ তরুতলে উভয়ে আশ্রয় পাইয়াছিল। কলিকাতার বহু বন্ধুর মধ্যে প্রবোধ শরৎকেই সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন বলিয়া মনে করিত। শরৎও তাহাকে সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে উপকৃত করিত। দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন বড় দৃঢ় ছিল।

যে বয়সে সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলের বিবাহ হয়, উভয়েই সে বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিল। উভয়েরই অভিভাবক তাহাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিবাহে কাহারও অনিচ্ছা ছিল না। অবিবাহিত অবস্থায় বিবাহিত জীবনের প্রতি একটা মমতা ও আকর্ষণ থাকে। অস্মদ্দেশে বিবাহকে "দিল্লীকা লাড্ডুর" সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে; যে উহা আহার না করে সেও দুঃখিত হয়, এবং যে উহার আস্বাদ গ্রহণ করে সেও পশ্চাত্তাপ করে। কোনও বিদেশীয় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, যাহারা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ, তাহারা উহা হইতে মুক্ত হইতে চাহে, এবং যাহারা ঐ বন্ধনে বদ্ধ নহে, তাহারা বদ্ধ হইতে চাহে। শরতের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার স্বামী কোনও ইংরাজ বণিকের হাউসে বড় চাকরী করিতেন। তাঁহার এক বিবাহযোগ্যা ভগিনীর সহিত শরতের বিবাহের প্রস্তাব হয়। শরতের ভগিনীর বড় ইচ্ছা ছিল যে, ননন্দার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দেন; তাঁহার স্বামী যোগেশ বাবুরও তাহাতে আপত্তি ছিল না। সুকুমারীর আগ্রহাতিশয্যে শরতের বৃদ্ধা মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বিবাহে মত দিয়াছিলেন। বালিকার রূপলাবণ্যের অভাব ছিল না; এবং প্রতিবেশিনীগণ তাহাকে চঞ্চল বলিলেও সুকুমারী বিশ্বাস করিতেন যে, বিবাহের পর সে চাঞ্চল্য থাকিবে না। শরৎ প্রায়ই দিদিকে দেখিতে যাইত। সে বাল্যকাল হইতেই লীলাকে

দেখিতেছে, আবার ভগিনী তাহার মন বুঝিবার জন্য লীলার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছে।

ইহাতে সুকুমারী স্থির করিয়াছিলেন যে, শরতের এ বিবাহে ইচ্ছা আছে। ভগিনীর মতের উপর নির্ভর করিয়া শরতের জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারও ভাবিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে ভ্রাতার মত আছে। কিন্তু সুকুমারীর হিসাবের মূলেই একটা বড় ভ্রম ছিল—শরৎ একবারও ভাবে নাই যে, সুন্দরী বালিকাকে সুন্দরী বলিলে তাহার প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়। সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় কোন দোষ আছে, ইহা সে বুঝিত না। সে তাহার রাশীকৃত পুস্তক ও কাগজের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিল; লীলাকে বিবাহ করিবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল না।

একদিন শরৎ সহসা এ বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। ভ্রাতার কথায় বসন্তকুমার কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলেন না।

এই সময় একদিন কোনও কর্ম্মোপলক্ষে সুকুমারী পিত্রালয়ে আসিবার সময় লীলাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দিন প্রবোধ বন্ধুগৃহে আসিয়া বিহগকলতানমুখরিত সায়াহ্নে তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী রূপবতী লীলাকে দেখিল; এবং দেখিয়া শরৎকে তাহার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। উভয়ের কথোপকথনের শেষটা এইরূপ:—

শরৎ বলিল, "মেয়েটি দেখিলে কেমন?"

প্রবোধ বলিল, "আমাদের করির চক্ষু নহে—তবে বলিতে পারি, মেয়েটি স্থন্দরী।"

"তোমার সঙ্গে বেশ মানায়।"

বাস্তবিক প্রবোধ স্থপুরুষ।

"তুমি কি পাগল হইলে না কি ?"

"না,—সত্য বল ; অমন মেয়ে বিবাহ করিতে তোমার কোনও আপত্তি আছে কি না ?"

প্রবোধ স্বীকার করিল যে,লীলার রূপ অনন্যসাধারণ বটে।

শরৎ সে কথা, প্রবোধের যে দূরসম্পর্কীয় পিতামহ তাহাদের গৃহে থাকিতেন, তাঁহাকে দিয়া প্রবোধের জ্যেষ্ঠকে জানাইল। যে মতামতের গোলমাল ও বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা বার্দ্ধক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহার ফলে বৃদ্ধ কথাটা বলিতে একটু গোল পাকাইলেন। কাযেই জ্যেষ্ঠ স্থবোধচন্দ্র শরৎকে ডাকাইয়া সব শুনিলেন। বালিকা যে স্থন্দরী, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। প্রবোধের সংসারে তিন কর্ত্তা—বিধবা জ্যেষ্ঠ-তাতপত্নী, জননী ও জ্যেষ্ঠ। অনেক স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিলে একের মত হয়, ত অন্যের মত হয় না ; এবার কিন্তু তিন জনেরই মত হইল। শরৎ স্থখী হইল।

তাহার পর প্রবোধ শুনিল যে, সেখানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সে ভাবিল, হয় ত কেবল তাহারই জন্য শরৎ নিজে বিবাহ করিতেছে না। ফলে তাহারা যে কথাবার্ত্তা কহিল

ও যাহা স্থির করিল, গঙ্গাতীরে তাহাদিগের কথোপকথনে তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর প্রবোধ বিবাহে আর কোনও আপত্তি করিল না। তাহার জ্যেষ্ঠ যোগেশ বাবুকে পাকা দেখার দিন স্থির করিতে বলিলেন।

যেদিন নদীতীরে তাহাদিগের কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পরদিবস বন্ধুগৃহে গিয়া শরৎ সকল সংবাদ লইয়া আসিল। সেখানে নানা গল্পে অপরাহ্ণ কাটাইয়া সন্ধ্যাদীপালোকিত পথে সে গৃহে ফিরিল। আসিবার সময় সে পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিল,—"যে উত্তাপে বৃক্ষপত্র শুকাইয়া উঠে, সেই উত্তাপেই জলদ উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে শীতল করে। হায়! সকল আকাঙ্ক্ষারই বাঞ্ছিত আছে; বুঝি তৃপ্তিও আছে! আমারই কি কাঁদিয়া জীবন কাটিবে?"

শরৎ যখন বিবাহে অমত প্রকাশ করিল, এবং ধনী প্রবোধের জ্যেষ্ঠ যখন ভ্রাতার সহিত লীলার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন যোগেশ বাবু প্রবোধের সহিত ভগিনীর বিবাহ স্থির করিলেন। শরৎ নিষ্কৃতি পাইল।

শরতের জননী শরৎকে বলিলেন, "প্রবোধের বিবাহ ত স্থির করিলি—এখন নিজে বিবাহ কর।" শরৎ হাসিল। বসন্তকুমার ভ্রাতার মতামতের অপেক্ষায় রহিলেন। শরৎও কয় দিন বড় উদ্বিগ্ন রহিল। তাহার পর কয়দিন কয়টা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিল; ছন্দ মিলাইতে না পারিয়া সব গুলা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহিতে অবিবাহিতে।

লীলার সহিত প্রবোধের বিবাহ হইয়া গেল। যখন উষালোক প্রথম পূর্ব্ব গগনে জীবন জাগাইয়া তুলে, তখন যেমন অরুণ-রাগ, বিহগকাকলি, প্রভাতপবন, তরুলতার মৃদুমর্ম্মর, কুসুমের মধুগন্ধ, সকল সম্মিলিত হইয়া এক আনন্দহিল্লোলে প্রভাত পূর্ণ করে, তেমনই নববিকশিত প্রেম, শত আশা, অনন্ত আনন্দ, আকুল উদ্বেগ, সকল সম্মিলিত হইয়া নববিবাহিতের হৃদয়ে আনন্দপ্লাবন আনয়ন করে। প্রবোধ সেই প্লাবনে ভাসিয়া গেল। প্রবোধের বিবাহে শরৎ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিল। তাহার বিবাহরজনীতে গৃহে ফিরিয়া আপনার ডায়েরীতে লিখিল :—

"প্রবোধের বিবাহ হইয়া গেল। প্রবোধ আপনি দেখিয়া লীলাকে বিবাহ করিয়াছে। আশা করি, নবদম্পতী সুখী হইবে। বিবাহিত জীবনে নানা কর্ত্তব্য আছে। হয় ত কেহ ভাবিতে পারেন, অবিবাহিতের পক্ষে বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই ধৃষ্টতা, কিন্তু কত বন্ধ্যা নারী ত জননীর অপেক্ষা অধিক যত্নে শিশু পালন করিতে পারেন; যিনি কখনও কবিতা লেখেন নাই, তিনিই ত অনেক সময়

কবিতার উত্তম সমালোচক। প্রবোধ ও লীলা সুখী হউক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।”

তাহার পরেই লিখিল ঃ—

“জীবন একটা প্রহেলিকা—বিষম প্রহেলিকা! কিন্তু জীবনে কেবল আপনার সুখদুঃখ লইয়া ব্যস্ত থাকিবার অধিকার কাহারও আছে কি না? মানবের মন নদীর সহিত উপমেয়; উভয়ই পবিত্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল হইতে পারে; ধরণী ও অম্বর প্রতিবিম্বিত করিয়া, উভয়ে অসীমসৌন্দর্য্যময় হইতে পারে; উভয়েই আপন আপন কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তির চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে। প্রথমাবস্থায় উভয়ই পবিত্র, কিন্তু মলিন হইলে আবার তাহাদের মত অনিষ্ট আর কেহ করিতে পারে না। কিন্তু মানব মনের বশ, না মন মানবের বশ? আমার মন এখন যে অবস্থাপন্ন, তাহাতে আমিই তাহার বশ।”

এই গ্রন্থে আমাকে পুনঃ পুনঃ শরতের এই ডায়েরীর উল্লেখ করিতে হইবে। অল্পবয়স হইতেই শরৎ ডায়েরী লিখিত; যাহারা কাহারও নিকট আপনাদিগের সুখদুঃখ প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাদিগের পক্ষে মনোভাবপ্রকাশের এমন পাত্র আর নাই।

প্রবোধ তাহার বিবাহিত জীবনের নানা সুখময় কাহিনী শরতকে বলিত। “লিলি” (প্রবোধ লীলা হইতে “লিলি” করিয়া লইয়াছিল) কি করিল, কি বলিল, তাহা সব সে

শরৎকে বলিত। প্রবোধের সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু লীলার কথা শুনিয়া শরৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু চিন্তিত হইল। দুই এক দিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শরৎ দুই একটা উপদেশ বা পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিল,—প্রবোধ তাহা বুঝিল না।

শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস কাটিয়া গেল। আকাশে শরতের লঘু মেঘ, স্বপ্নের মত চিত্র ভাঙ্গে গড়ে; আর নিম্নে নদীকূলে সোনার ধান বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলে; বৃক্ষপত্রে স্নিগ্ধশ্যামশোভা, প্রকৃতি চিরদিন সৌন্দর্য্যময়ী। এবার আশ্বিনের প্রথমেই দুর্গোৎসব; শরতের কলেজ বন্ধ হইল। এদিকে সুকুমারীর এক পুত্রের অনেক দিন হইতে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, চিকিৎসায় সারিল না। ডাক্তার পশ্চিমযাত্রার পরামর্শ দিলেন—যোগেশ বাবু আফিসে ছুটি লইয়া পশ্চিম-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। আশ্বিনের প্রথমেই সুকুমারী পুত্রকে লইয়া মুঙ্গেরে গমন করিলেন; সুকুমারীর স্বামীর সংসার বড় নহে; বৃদ্ধা মাতা অসুস্থশরীরে বিদেশে যাইতে চাহিলেন না, কাযেই যোগেশ বাবুর কনিষ্ঠ সুরেশচন্দ্রকে কলিকাতায় থাকিতে হইল। সুকুমারী, যোগেশ বাবু ও তাঁহা-দিগের তিন কন্যা, দুই পুত্র মুঙ্গেরে যাইবেন; দিদির অনুরোধে শরৎও সঙ্গে চলিল। লীলা দাদার কাছে জিদ ধরিল, সেও যাইবে। যোগেশ বাবু প্রবোধের জ্যেষ্ঠকে বলিয়া তাহাকে দিন কতকের জন্য মুঙ্গেরে লইয়া গেলেন।

সকলে মুঙ্গেরে যাইবার পর প্রায় দশ দিন পরে বসন্তকুমার সুকুমারীর এক পত্র পাইলেন; তাহার একাংশ এইরূপ :—

"শরৎ এখানে আসিয়া বড় ভাল নাই। সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়—চেহারা ক্রমেই খারাপ হইয়াছে। আমি ভাই, বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তোমাকে এতবার বলি, শরতের বিবাহ দাও, তা আমাদের কথা ত আর তোমার কানে উঠ্‌বে না, এবার বৌকে লিখে দেব, দেবরের বিবাহের জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করে। একটি ভাল মেয়ে দেখে ভায়ের বিয়ে দাও।"

বসন্তকুমার প্রথমে ভাবিলেন, ব্যাপার কিছুই নহে। কিন্তু সুকুমারী বড় ভয় পাইয়া আবার একখানা পত্র লিখিলেন। তখন তিনি বিবাহ সম্বন্ধে শরতের মতামত জানিতে যোগেশ বাবুকে পত্র দিলেন। যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল :—

"বসন্ত, তোমার পত্র পাইয়াছি। শরতকে জেরা করা সহজ নহে; আর যদি অমন কাজই পারিব, তবে ছাই 'সাহেবের' চাকরী ছাড়িয়া উকিল হইলেই পারি! আমি বলি, সে ব্যাপার সহজ নহে। অত জল-বেড়াবেড়ির সময় কই? আফিসের কাজ নাই বটে, কিন্তু তামাক আর তোমার দিদি ত আছেন, এবং ইচ্ছা করি চিরদিনই থাকুন। তোমার দিদি ত শরতের পাগল হইবার ভয়ে আকুল।

"দেখ, এক জন জমীদার বাটিতে মাষ্টার রাখিয়া ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহার নিজের বড় বিদ্যা ছিল না; একদিন যে ঘরে ছেলে পড়িত, সেই ঘরের পার্শ্বের বারান্দায় যাইতে শুনিলেন, শিক্ষক ছেলেকে ভূগোল পড়াইতেছেন। বাবু তখনই মাষ্টারকে বলিলেন, 'দেখ্ আমার ছেলেকে যদি ভূগোল পড়াবি, ত তোর ভাল হবে না। এত তফাৎ ঢাকা, আর তোরা দেখাবি ঐ ঢাকা; ওরে পথ ঘাট চিনিয়ে কাজ নাই, বাড়াবাড়ি ভাল নয়।' তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, এক মাষ্টার রেখে ভায়াকে ইংরাজী কাব্য পড়ান হইল; এখন লায়েক হইয়া ভায়া যদি একটু কবিতাপাগল না হয়, তবে পড়াই বৃথা গেল। যাক্—শরৎ ক্ষেপে নাই, ক্ষেপিবেও না। তোমার দিদি যতই রাগ করুন, তোমাদের ভাই ভগিনী সকলেরই একটু পাগলের ছিট্ আছে। শরৎ একটু পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে, এই পর্য্যন্ত।

"যে কয় স্থানে বিবাহের কথা লিখিয়াছ, তাহার মধ্যে বোধ হয়,—বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে শরতের একটু সম্মতি আছে। ও কথা পাড়িলে সে কথা চাপা দেয়। অনেক প্রশ্নে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে অন্য স্থানে বিবাহে সে অসম্মতিপ্রকাশ করিলেও, ওখানকার কথায় সে অসম্মতিপ্রকাশ করে না। এ বিষয়ে তোমার দিদির মত আর আমার মত এক, আশ্চর্য্য নহে কি?"

"তুমি মেয়ে দেখ,ততদিন বর ক্ষেপিবে না। যদি ঠাকুরাণীর কাছে ছুটি পাও, তবে একবার নয় মুঙ্গেরে বেড়াইয়া গেলে?

"খোকা কিছু ভাল। আমরা আর সকলে ভাল আছি। লীলার ভাশুর তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন; এখন যদি তাহাকে পাঠাইতে হয়, তবে শরৎ তাহাকে লইয়া যাইবে। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযোগেশ।"

পত্র হস্তগত হইলে বসন্তকুমার ভাবিলেন, শরতের নিকট যে অতটুকু মত পাওয়া গিয়াছে, তাই যথেষ্ট; তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে হইবে।

শরৎ মুঙ্গেরে রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবনোন্মেষ।

লীলা মুঙ্গেরে আসিল ; কিন্তু আসিয়া দেখিল, কিছু ভাল লাগে না। মানব-হৃদয় দর্পণের সহিত তুলনীয় ; তাহাতে জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয় ; কিন্তু হৃদয়-দর্পণে যখন যৌবনের বাষ্প পতিত হয়, তখন তাহাতে পূর্ব্বের সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দ আর তেমন উজ্জ্বল দেখায় না। ফুল ফুটিবার আগে একরূপ থাকে; ফুটিলে অন্যরূপ হয়। প্রথম-যৌবনোন্মেষের সময় যুবতী পূর্ব্বাভ্যস্ত সুখদুঃখের মধ্যে, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আর পূর্ব্ব ভাব পায়েন না—সে যৌবনের অঙ্কুর।

লীলা মুঙ্গেরে আসিবার কিছুদিন পরেই প্রবোধের জ্যেষ্ঠ তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ইতিমধ্যে প্রবোধ পত্নীকে পত্র লিখিয়াছে, লীলাও তাহার উত্তর দিয়াছে ; কিন্তু সে পত্রের প্রত্যাশায় সে কখনও ব্যগ্র হয় নাই। প্রবোধ শরৎকেও পত্র লিখিত ; তাহাতে নানা কথা, "লিলির" কথা, তাহার কথা, কলিকাতার কথা, কত কথাই থাকিত। মুঙ্গেরে আসিয়া প্রথমে সুকুমারীর পুত্রের জ্বর বাড়িয়াছিল।

যোগেশ বাবু রোগীর শুশ্রূষা করিতে অক্ষম; সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কাজেই শুশ্রূষার ভার শরৎ ও লীলার উপর পড়িয়াছিল। চঞ্চলা লীলা যেমন করিয়া তাঁহার ছেলের শুশ্রূষা করিল, তাহাতে সুকুমারী আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, আমি ত চিরকালই জানি, বিবাহের জল গায় পড়িলে লীলার চাঞ্চল্য যাইবে। শরতের সবই অদ্ভুত, কিছুতেই বিবাহ করিল না।

ছেলে শীঘ্রই সারিয়া উঠিল; কিন্তু উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি জাগিয়া শরৎ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চতুর্থ দিবসে তাহার বড় মাথা ধরিল। সুকুমারী ভ্রাতার মাথায় ইউডিকোলোন দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া আসিলে লীলা বহুক্ষণ বসিয়া বাতাস করিল, তাহার পর শরৎ ঘুমাইলে উঠিয়া আসিল।

তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া শরৎ আবার পাহাড়ে বেড়াইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া প্রবোধকে পত্র লিখিল, তাহাতে লীলার গুণের কথা লিখিল। শরৎ যখন পত্র লিখে, সেই সময় লীলা একবার বাহিরের ঘরে আসিল; শরৎকে নিবিষ্টচিত্তে পত্র লিখিতে দেখিয়া, কোথায় পত্র লিখিতেছে, জিজ্ঞাসা করিল। শরৎ প্রবোধের নাম করিলে লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে যখন সেই রক্তিমা মিলাইয়া গেল, তখন তাহার আননে অপহৃত-অস্ত-রবিরশ্মি

আকাশে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের ন্যায় ম্লানভাব দৃষ্ট হইল, লীলা চলিয়া গেল। শরৎ ভাবিল, লজ্জা।

সুকুমারীর পুত্র ক্রমেই সারিয়া উঠিতে লাগিল। যোগেশ বাবু আফিসের ছুটি বাড়াইলেন।

শরৎ সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাইত; বেলা হইলে গৃহে ফিরিত। দ্বিপ্রহরটা গৃহে কাটাইত; হয় পড়িত, নয় ত কিছু লিখিত; আবার অপরাহ্ণে একখানা পুস্তক, কাগজ, পেন্সিল লইয়া বাহির হইত। যোগেশ বাবু বিশ্বাস করিতেন না যে, সে কিছু পড়িত। হয় কোনও পাহাড়ের উপর বসিয়া করতল-লগ্নশীর্ষ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত; কোন কোন দিন কবিতা লিখিত; নয় ত নদীসৈকতে বসিয়া নদীর শোভা দেখিত—চঞ্চল তরঙ্গদল ছুটিতেছে, পরপারে তরুলতার সবুজ আভা কে যেন আকাশের কোলে আঁকিয়া দিয়াছে! যখন যূথিকাশাখায় কুসুমের মত, আকাশে তারকামালা ফুটিয়া উঠিত, ক্ষীণ চন্দ্র গগনপ্রান্ত হইতে উঁকি দিত, তখন সে গৃহে ফিরিত।

গৃহে ফিরিয়া তাহার কার্য্য ছিল, যোগেশ বাবুর সহিত তর্ক করা। যোগেশ বাবুর তর্ক করা কর্ম্মাভাবপ্রযুক্ত; তিনি তামাক টানিতে টানিতে এক একটা কথা বলিতেন, আর শরৎ তর্ক করিত। যোগেশ বাবুর সহিত তর্কে শরতের খুব মুখ খুলিত। এক এক দিন গৃহকর্ম্ম সারিয়া সুকুমারী সেখানে

আসিয়া বসিতেন—লীলাও তাঁহার সহিত আসিত; সেদিন তর্ক অতিরিক্ত সংযত ভাবে হইত। তাহার পর সুকুমারী রন্ধনের পরে ডাকিলে তর্ক থামিত। সুকুমারী হাসিয়া বলিতেন, "আমাদের বাড়ী প্রতি সন্ধ্যায় ঝড় উঠে।"

একদিন প্রেম লইয়া দুই জনে তর্ক বাধিল। শরৎ বলিল, "এখন আমরা যাহাকে প্রেমের আদর্শ বলি, সে আদর্শ প্রতীচ্য। প্রাচ্য আদর্শে পুরুষের স্বার্থপরতা বড় অধিক দেখা যায়। প্রাচ্য আদর্শে স্ত্রী স্বামীর 'সহধর্ম্মিণী' নাম মাত্র, কোনও কার্য্যে সাহায্যকারিণী বা পরামর্শদাত্রী নহেন। দাসীমাত্র।"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "কেন?"

"কেবল কালিদাস অজের মুখ দিয়া প্রতীচ্য প্রেমের মত প্রেমের কথা বলাইয়াছেন,

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

মহাভারতে আছে, স্ত্রীর সহিত মিথ্যা কহিলেও পাপ নাই। এক রামসীতার প্রেমই প্রাচ্য প্রেমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কাটাইয়াছে; তথাপি রাক্ষসবধান্তে সীতার প্রতি রামের বাক্য পাঠ করিলে রামের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। সংস্কৃত-সাহিত্য-রত্নাকরে বহু রমণীরত্নের সন্ধান পাওয়া যায়;

কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতিভা ফুটিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য প্রেমের আদর্শ আর প্রাচ্য প্রেমের আদর্শ বড় ভিন্ন।"

"পাশ্চাত্য প্রেমের কি বড়ই প্রয়োজন?"

"প্রেম না থাকিলে মানব-হৃদয় অম্বুধিমধ্যস্থ, লতাপাদপ-হীন, জীববাসের অযোগ্য, মরুময় দ্বীপের সহিত তুলনীয় হইত। প্রাচ্য প্রেম প্রেমই নহে; যে প্রেম স্ত্রীকে স্বামীর সর্ব্ব কার্য্যে সাহায্যকারিণী না করে, সে প্রেম প্রেমের অবমাননা।"

"তাহাতে আমাদের সংসার বেশ চলিত।"

"সংসার গোল্লায়ের পথে চলিত। আপনি পাশ্চাত্য প্রেমের আদর্শের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন; এখন তাহার নিন্দা করিলে চলিবে কেন?"

"হিন্দু মহিলা কোন্ অংশে বিদেশীয় মহিলাগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট?"

"কমলে ও গোলাপে তুলনা হয় না। পাশ্চাত্য মহিলার অনেক গুণ প্রাচ্য মহিলায় নাই, প্রাচ্য মহিলার অনেক গুণ পাশ্চাত্য মহিলায় নাই। কিন্তু প্রাচ্য মহিলার গুণরাশি কি প্রাচ্য প্রেমের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে একটা যুক্তি?"

"প্রেম কাহাকে বল?—কেবল কি নারীপ্রেমই প্রেম? কেন, অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, এ সকলও ত প্রেমের অংশ। মোটের উপর দেখ।"

"প্রেম অংশ করা যায় না। প্রেম প্রজ্বলিত দীপশিখা,

তাহা হইতে শত দীপ প্রজ্বালিত করিলে তাহার জ্যোতির হ্রাস হয় না; কিন্তু সকল দীপশিখার উজ্জলতা সমান নহে। প্রেমালোকে হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হয়—তাহার অংশ কে করিতে চাহিবে—চাহিলেও কে পারিবে?”

“তোমরা স্বাধীন প্রণয়ের আর্জ্জি দাখিল করিতেছ। প্রাচ্য আচারের আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবে না।”

“না করিতে পারে। আমার বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে। ইহাকে ঠিক স্বাধীন প্রণয়ও বলা যায় না।”

“স্বাধীন প্রণয়,—তাহার ফল সমাজবন্ধনের শিথিলতা—তাহার ফল পাপ।”

“প্রণয়ে পাপ নাই; ভোগলিপ্সা ও প্রণয় এক নহে। প্রণয়ে পাপ নাই।”

এই সময় লীলা তাঁহাদিগকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিল। যোগেশ বাবু হাসিতে হাসিতে শরৎকে বলিলেন, “তা, বুঝেছি; তোমার একটা ‘আমেজন’ চাহি, না একটা ‘নিউ ওম্যান’ চাহি?”

সেই রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া লীলা কি ভাবিতে লাগিল। বাহিরে যাইবার সময় সে শরতের শেষ কথা—“প্রণয়ে পাপ নাই”—শুনিতে পাইয়াছিল। অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীতে নিবিড়চিক্কণান্ধকারমধ্যে বিদ্যুৎবিকাশ হইলে, যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে বনান্তের বিচিত্র শোভা প্রকাশিত হয়, তেমনই

তাহার সেই এক কথায় লীলার হৃদয়মধ্যে শত চিন্তা প্রবেশিত হইল। হায়!—সময় সময় সামান্য কথায় হৃদয়ে কত ভাবই জাগিয়া উঠে! লীলা ভাবিতে লাগিল, প্রণয়ে পাপ নাই।

শরৎ লক্ষ্য করিল, লীলা বড় বিষণ্ণা। তাহাকে দেখিলে লীলার মলিন মুখে সহসা এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার পরেই মুখ ম্লান হইয়া যায়। লীলা প্রায় তাহার সাক্ষাতে আসিতে চাহে না; কোনও ক্রমে আসিয়া পড়িলে যেন বড় লজ্জা অনুভব করে, তাহার দিকে চাহে না। শরৎ ভাবিল, এ কি! ইহার কয় দিন পরেই শরৎ লীলাকে কলিকাতায় লইয়া গেল। তাহাকে বড় চিন্তাযুক্ত দেখিয়া প্রবোধ দুই একবার তাহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল;—শরৎ বলিল, "কিছুই নহে।" প্রবোধ ভাবিল, শরতের কবিতা-রোগের আবার বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

বিপত্নী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

"লিলি, আমাকে কাল সকালে জাগাইয়া দিও।"

প্রথম ফাল্গুনের বাতাস একটা মুক্তবাতায়নপথে কক্ষের মধ্যে পুষ্পের মৃদু মধুগন্ধ বহিতেছে; শব্দমুখরিত সহর স্তব্ধ। প্রবোধ লীলাকে এই কথা বলিল। লীলা বলিল, "কেন?"

"কাল সকালে শরতের বিবাহের পাত্রী দেখিতে যাইব।"

লীলা একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘরে আলোক ছিল না; কিন্তু প্রবোধ অনুভব করিল, যেন একটু তপ্ত বাতাস তাহার কপালে লাগিল।

তাহার পর লীলা বলিল, "বিবাহ কোথায়?"

"এখনও স্থির হয় নাই—এই ত কেবল কনে দেখা! পাত্রী ছাড়া বিবাহের আর সবই স্থির আছে। নিতান্ত না হয়, আমারটাই না হয় শরৎকে দিব। কি বল?"

"তোমার ঐ ঠাট্টা। আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।"

"কেন—তোমার সঙ্গেও ত শরতের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল?"

"তাই কি?"

"তাই—আর কি।"

"যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।"

স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিমানে চিরকাল যাহা হয়, তাহাই হইল। চুম্বনবিনিময়ে সব রাগ ভাসিয়া গেল। তাহার পর প্রবোধ ঘুমাইল—লীলার মনে বহুদিনের একটা কথা উদিত হইল,—প্রণয়ে পাপ নাই। বিদ্যুৎহাস্যময়ী বর্ষা গিরিশিরে তাহার নিশীথনিবিড় কুন্তলজাল এলাইয়া দিলে যেমন এক দিন জলধরধারাপাতে পর্ব্বত-অঙ্গে শত সুপ্ত নির্ঝরে বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই আজ শরতের সেই এক কথায় তাহার মনে নানা চিন্তা উদিত হইল। উঠিয়া বসিয়া বহুক্ষণ সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। কেন কাঁদিল, জানি না; কিন্তু বড় যাতনা নহিলে কেহ তেমন করিয়া কাঁদিতে পারে না। সেই সময় ম্লান চন্দ্রের ম্লান জ্যোতিঃ শয্যার উপরে আসিয়া পড়িল—সেই অস্পষ্ট আলোকে সুপ্ত প্রবোধের মুখ কেমন দেখাইতে লাগিল। লীলার অশ্রুপ্লাবিত নয়নে বোধ করি, তাহা আরও কেমন দেখাইয়াছিল। অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মুখ নামাইয়া লীলা প্রবোধের মুখচুম্বন করিল—সেই চুম্বনদানকালে তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছিল।

সেই সময় একটু বেগে বাতাস বহিল—টেবিলের উপর হইতে একখানা সংবাদপত্র খস্ করিয়া উড়িয়া হর্ম্ম্যতলে পড়িল। লীলা একটু ভয় পাইল, প্রবোধের একখানা হাত

চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বসিয়া বসিয়া লীলা ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ম্লান চন্দ্রালোক বাতায়নপথ হইতে সরিয়া গেল—ঘর আবার অন্ধকার হইল, লীলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার পর দূরে হর্ম্ম্যরাশির অন্তরালে আকাশ কোমল অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইল, লোহিত গোলক যেন চিত্রে চিত্রিতবৎ দেখাইতে লাগিল। লীলা প্রবোধকে জাগাইয়া দিল, প্রবোধ উঠিয়া গেল।

সেই দিন নিশীথে লীলা প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "শরৎ বাবুর কনে দেখিয়া আসিলে ?"

প্রবোধ বলিল, "হাঁ—এখানে বিবাহ হইতে পারে।"

"মেয়ে কেমন ?"

"খুব ভাল।"

প্রবোধের মনে একটু পরিহাস-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল, লীলার চিবুক ধরিয়া সে বলিল, "কেন, তোমার হিংসা হইতেছে নাকি ? আচ্ছা,—তোমার মত অত সুন্দরী নহে।"

হাতখান ঠেলিয়া দিয়া লীলা বলিল, "যাও! কখনও কি আমি বলেছি যে, আমি ডানা-কাটা পরী। হইলাম নয় আমি কুরূপা—তা অত ঠাট্টা কেন ?"

প্রবোধ বলিল, "না, না ; সত্যই আমাদের সৌন্দর্য্য-বিচারের পথে বড় বাধা আছে।"

"কি ?"

"আমার কথাই ধর। আমার মন তোমার চিন্তাতেই পূর্ণ, আমার কাছে তুমি সকল সৌন্দর্য্যের সার। কাজেই সৌন্দর্য্য-বিচার করিতে হইলে, আমি তোমার সহিত তুলনায় বিচার করিব। সেই কথাই বলিতেছি। আমার হৃদয় তোমাতে পূর্ণ।"

"আমার ত রূপের সীমা নাই।"

"না, তুমি বড় কুরূপা। তবে এমন কুরূপা প্রায় দেখা যায় না।"

লীলা বোধ হয়, ঐ কথাটা শুনিবার জন্যই ঝগড়া করিয়াছিল। রমণী রূপসী হইলে আপনার রূপের প্রশংসা শুনিতে চাহে। আপনার প্রশংসা শুনিলে বোধ করি, সন্ন্যাসীও আনন্দিত হয়।

প্রবোধ লীলার মুখ চুম্বন করিল। লীলা তাহার কোমল বাহুপাশে প্রবোধের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে তাহার মুখ পূর্ণ করিয়া দিল। ঝগড়া মিটিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নূতন জীবন।

আমাদিগের জনকজননী, আমাদিগেকে কিরূপ প্রগাঢ়ভাবে স্নেহ করেন, প্রথমে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না—তাই সে স্নেহের প্রতিদানও দিই না। শেষে যখন সন্তানের হাসি-মুখ আমাদের হৃদয় উজ্জ্বল করে, তখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি, এবং যেন সেই ক্ষতিপূরণের জন্যই সন্তানদিগকে অত্যধিকপরিমাণে স্নেহ করিতে আরম্ভ করি। অপত্যস্নেহ মানবের বড় প্রবল বৃত্তি, তাহার সম্মুখে জগতের অনেক কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায়। এই অপত্যস্নেহ পুরুষ অপেক্ষা রমণীহৃদয়ে অধিক প্রবল। রমণীর মধ্যে আবার কাহারও কাহারও হৃদয়ে তাহা অত্যন্ত প্রবল। সুকুমারী তাঁহাদিগের একজন। তাঁহার অপত্যস্নেহ অত্যধিক প্রবল। পুত্রের অসুখ যত কমিতে লাগিল, সুকুমারীর সদাপ্রফুল্ল মুখের উপর হইতে চিন্তার ছায়া তত সরিয়া যাইতে লাগিল; যেন জ্যোৎস্নার উপর হইতে মেঘ সরিতে লাগিল। পুত্র সারিতে লাগিল; চিকিৎসকগণ তাহার আরও কিছুদিন পশ্চিমে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। শরতের অধ্যয়ন আছে। যোগেশ বাবুর আফিসের ছুটি ফুরাইয়া গেল। সুরেশ মুঙ্গেরে গেল, যোগেশ বাবু আবার কলিকাতায় আসিয়া

নিত্য চাপকান আঁটিয়া আফিস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও কাযেই তাঁহার মন লাগিল না। সুকুমারী কাছে না থাকিলে তাঁহার কোনও কাযেই মন লাগে না—সুকুমারীর সহিত ঝগড়া করিতে না পাইলে তাঁহার দিনগুলা অসম্ভব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। দুই মাস কার্য্য করিয়া আবার মাস দুইয়ের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, তিনি পোর্টমেণ্ট গুছাইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

ফাল্গুন মাসে বড় গরম পড়িল, "সাহেবের" বড় তাগিদ পড়িল, আর শরতের বিবাহ পড়িল। তখন সুস্থ পুত্র লইয়া হাসিমুখে সুকুমারী ও যোগেশ বাবু কলিকাতায় ফিরিলেন। যোগেশ বাবুর বৃদ্ধা জননী পরিচিতাদিগের নিকট গল্প করিবার অবকাশ পাইলেন—কত করিয়া তাঁহার নাতি বাঁচিয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি বলিতে ছাড়িলেন না, যে, তাঁহার কথামত প্রথম হইতে ছেলেকে "তেত" খাওয়াইলে তাহার এমন অসুখ হইতেই পাইত না। দুঃখ করাটা বার্দ্ধক্যের চিরলক্ষণ; কাযেই সে গত দুষ্কর্ম্মের জন্য কেহই তত দুঃখিত হইল না। তিনি বলিয়া তৃপ্ত হইলে, তাহাতে কাহারও কোনরূপ ইষ্টানিষ্ট নাই।

শরৎ লীলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই, যেখানে শরতের বিবাহে সম্মতি ছিল, বসন্তকুমার সেখানে তাহার বিবাহের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। না হই-

বার প্রধান কারণ, তাঁহার জননীর আপত্তি। বালিকার জননীর "মেম" অপবাদ ছিল—তাহাই আপত্তির প্রধান কারণ। তাহার পর কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, কাটিয়া গেল—শরৎ বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। জননীর সাধ্যসাধনা, ভ্রাতার অনুরোধ, বন্ধুবান্ধবের বিদ্রূপ, সকলই ব্যর্থ হইল। শরৎ কেবল রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। বসন্তকুমার বড় চিন্তিত হইলেন।

ফাল্গুনের প্রথমে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রবোধের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া শরৎ আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। রুদ্ধ দ্বারে আলোকের দিক হইতে চেয়ারখানা ঘুরাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। বহুক্ষণ শরৎ স্থির নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

কে দ্বারে করাঘাত করিলেন। শরৎ চমকিয়া উঠিল—যেন সে তাহার স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দ্বার খুলিয়া দেখিল—দ্বারে দাঁড়াইয়া, বসন্তকুমার। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বসন্তকুমার একখানা চেয়ারে বসিয়া শরৎকে বসিতে বলিলেন। শরৎ বসিল। বসন্তকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "শরৎ, তোমাকে একটা কাযের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

শরৎ বলিল, "কি ?"

"তুমি বিবাহ করিবে না কেন ?"

"আমি বিবাহ করিব।"

বসন্তকুমারের তর্কের উদ্যোগ মাটী হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "তুমি ত এতদিন বিবাহ করিতে অসম্মত ছিলে?"

"এতদিন ছিলাম, এখন আর নাই।"

"তবে আমি মেয়ে দেখি?"

"দেখুন।"

"তোমায় আপনি দেখিয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

ঊষায় দীপশিখা যেমন ম্লান দেখায়, শরতের মুখ তেমনই ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, "না, দাদা, তাহা হইবে না।" বসন্তকুমার ভাবিলেন, শরৎ বিদ্রূপ করিল নাকি? তিনি বলিলেন "ঠাট্টা নহে, সত্য বল।"

শরৎ বলিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

বসন্তকুমার উঠিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, শরৎ যাহা বলে, তাহাই করে।

বসন্তকুমার চলিয়া গেলে, ডায়েরী বাহির করিয়া শরৎ লিখিল:—

"এইমাত্র দাদা চলিয়া গেলেন। আমি আজ বিবাহে সম্মতি দিয়াছি। আমার আপত্তি থাকিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। আপনার যে শক্তি আছে, তাহা বর্দ্ধিত করা সকলেরই উচিত। আমার মনে এক ভীষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে— এখনও তাহা সন্দেহমাত্র। যদি তাহা সত্য হয়, তবে একদিন

আমার প্রভূত মানসিক ও নৈতিকবল আবশ্যক হইতে পারে। তাহা পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত রাখা উচিত। নৈতিকবল বর্দ্ধিত করিলে অবৈধ বাসনা সকল হীনবল হয়, ইহা প্রমাণিত সত্য। তাহাতে প্রলোভন কাটাইবার অশেষ সুবিধা।

"আমি ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলাম। যাহাকে কখনও চক্ষে দেখি নাই, একবার যাহার কণ্ঠস্বরও শুনি নাই—তাহারই জন্য পাগল হইয়াছিলাম। হয় ত আমি কেবল একটা মানসকল্পিত আদর্শের পশ্চাতে প্রধাবিত হইতেছিলাম; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আমার প্রেমের আকুলতা অল্প নহে, আর ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা রূপজ মোহ নহে; কারণ, আমি তাহাকে কখনও চক্ষে দেখি নাই। আমার বন্ধুবান্ধবেরা বলেন যে, আমি একটি অদ্ভুত জীব। আমার গোটাকতক বিশেষত্ব আছে সত্য, কিন্তু "

হয় ত জন্মিবে কেহ মোর সমতুল,
অসীম রয়েছে কাল. ধরণী বিপুল।

এখনই যে জন্মে নাই, এমনই কে বলিতে পারে? যাহা হউক, আমাকে অতীত ভুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যখন বিবাহ করিতেছি, তখন আমার ভাবিপত্নীকে যাহাতে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।

"আমার রহস্যপ্রিয় বন্ধুরা এখন বলিবেন :—

'কানাই কি অভাবে গৌর হ'লে তাই আমারে বল,

তোমার ব্রজে কিসের অভাব ছিল ও ভাই চিকণ কালো।'

আমি বলি, অভাব বিশেষ ছিল না, কিন্তু আবশ্যক একটু ছিল। আমি বিবাহ করিলে মা সন্তুষ্ট হইবেন; দাদার ভাবনা দূর হইবে; আমার ঘাড়ে কর্ত্তব্যের যোয়ালিটা ভাল করিয়া বসিবে; আর আমি যে সন্দেহ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিবাহে নিশ্চয় অসীম উপকার হইবে। আমি বিবাহ করিব।"

একটা দাঁড়ি দিয়া তাহার পর লিখিল, "আজ প্রবোধের কাছে গিয়াছিলাম। সে যেন সুখী হয়!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশায়।

শরতের বিবাহ স্থির হইল, শরৎ কিছুই বলিল না। শেষ-ফাল্গুনে প্রভাবতীর সহিত শরতের বিবাহ হইয়া গেল। প্রভা বাপ মার এক মেয়ে—বড় আদরের; সে বড় অল্পে আঘাত বোধ করে, বড় অল্পে ব্যথিতা হয়। শরৎ যেরূপ আদর্শ খুঁজিয়াছিল, প্রভা কতকটা সেইরূপ আদর্শেই গঠিতা। কতকটা বলিলাম, কারণ কল্পিতে ও বাস্তবে অনেক প্রভেদ।

শরতের বিবাহে প্রবোধ প্রভৃত পরিশ্রম করিল। জামা ছিঁড়িয়া, হাত পোড়াইয়া, মাথা ধরাইয়া প্রবোধ প্রভৃত পরিশ্রম করিল। কিন্তু শরতের মুখে কেমন একটু চিন্তার ছায়া। বসন্তকুমার ভাবিলেন, কল্পনাকৌশলী ভ্রাতা কল্পনাবলে বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য বড় গুরুতর মনে করিতেছে, তাই এ ভাবনা। প্রবোধ একটু বিদ্রূপ করিল। বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর যুবকযুবতীর হৃদয়ে প্রেমের পূর্ণিমা, ফুলশয্যা। সেইরাত্রে সুখসুপ্ত সুন্দরী পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া শরৎ চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। ফুলমালা খুলিয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া শরৎ আসিয়া চেয়ারে বসিয়া কাঁদিল। যে সকল কৌতূহলদীপ্ত রমণীনেত্র কোন রূপে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপের সুযোগ পাইয়াছিল, সে সকল নেত্রে অর্থপূর্ণ বিস্ময়বিস্ফারিত

দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গেল। ফুলশয্যা ত্যাগ করিয়া বর বসিয়া কাঁদিতেছে! তবে বুঝি বরের কনে পছন্দ হয় নাই! শুনিয়া অমঙ্গল-আশঙ্কায় শরতের জননীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া, শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পর লিখিলঃ—

মানস-সুন্দরী, এস, সাধনার ধন,
ফিরাও কর্ত্তব্যপথে ব্যথিত জীবন।
আশার প্রদীপ জ্বালি'
সে স্নিগ্ধ আলোক্ ঢালি'
আঁধার হৃদয়-মাঝে
ছড়াও কিরণ;
প্রশান্ত কোমল করে
এ হৃদয় মরু 'পরে
আনন্দসলিলধারা
কর গো সিঞ্চন;
এ চিরব্যথিত হৃদি
কাঁদিয়াছে নিরবধি,
ব্যথিতের মুখ চেয়ে
মুছাও নয়ন।
মানস-সুন্দরী, এস, সাধনার ধন,
হৃদয়-জলধি-গর্ভে কৌস্তুভ রতন

মানস-সুন্দরী, এস, সাধনার ধন,
ফিরাও কর্ত্তব্যপথে ব্যথিত জীবন।
ও প্রাণের শান্তি দিয়া
জুড়াও কাতর হিয়া,
শিখাও কর্ত্তব্য মোর
করিতে পালন;
দিয়েছি যে পদতলে
সে গেছে হৃদয় দলে'—
দলিত এ উপহার
করিব অর্পণ;
শান্তি ঢালি হৃদিমাঝে
এস তুমি প্রতি কাযে,
শিখাতে কর্ত্তব্য-ভার
করিতে বহন।
মানস-সুন্দরী, এস, সাধনার ধন,
হৃদয়-জলধিগর্ভে কৌস্তুভ রতন।

শরতের বিবাহরাত্রে শ্রান্ত প্রবোধ শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিল, লীলা তখনও বসিয়া আছে।

ইহা কিছু নূতন; লীলা কখনও প্রবোধের জন্য অপেক্ষা করিত না। লীলা প্রবোধকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, দুইবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। প্রবোধ শরতের বিবা-

হের কথা পাড়িয়া বিবাহব্যাপারের আদ্যোপান্ত বর্ণনা দাখিল করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

"তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইয়াছিল, তাই।"

"তা, কথা যোগাইল না কেন?"

"না, তুমি বড় ব্যস্ত দেখিলাম।"

"বটে!"

"হাঁ, এখন ঘুমাও।"

আদর করিয়া লীলার ভরা গালে প্রবোধ একটা ছোট-রকমের চড় মারিল; বলিল, "নিজের বুঝি ঘুম বড় পেয়েছে?"

লীলা বলিল, "ঐ দুঃখেই ত মারিতে চাহি; যে কথা বলি, তাহাই ঘুরাইয়া আমাকে বল। কেন, আমি ত পথের কা'রও বিয়ে দিতে যাই নি।"

"থাক্, এবার না হয় তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ করিব।"

লীলা প্রবোধকে একটা চড় দেখাইল, তাহার পর যাইয়া শুইয়া পড়িল।

সে রাত্রে প্রবোধ ঘুমাইল; কিন্তু লীলা জাগিয়া রহিল। সে প্রবোধকে শরতের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল, পারে নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লীলা স্বামীর সহিত মিথ্যা কথা কহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

প্রবোধের ইচ্ছা ছিল, লীলা একটু লেখাপড়া শিখে। লীলার বুদ্ধি ছিল, এবং সে পিত্রালয় হইতে কিছু বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখিয়াও আসিয়াছিল। প্রবোধ তাহাকে ইংরাজী পড়াইবার জন্য একজন ইংরাজ মহিলা এবং বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিল; কিন্তু লীলার লেখাপড়ায় কিছুই উন্নতি লক্ষিত হইল না। প্রথম প্রথম কয় দিন সে লেখাপড়া করিল, তাহার পর শেলাইয়ের উপরেই অধিক ঝোঁক দিল। শরৎ আপনি প্রভাকে পড়াইত; প্রভা বড় শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে লাগিল। প্রবোধ কয় দিন লীলাকে প্রভার কথা বলিল—যদি তাহাতে তাহার পাঠে চাড় হয়। লীলা বলিল,

"লোকের যাহা হইবে, আমারও যে তাহাই হইবে, এমন কিছু ধরা বাঁধা আছে?"

প্রবোধ বলিল, "নাই কেন?"

"আমার বুদ্ধি নাই বলিয়া। বুদ্ধিমতী দেখিয়া বিবাহ করিলে সে তোমার সঙ্গে ফড়্ ফড়্ করিয়া ইংরাজী বলিত, খানা খাইত, বেড়াইতে যাইত। কেন ইংরাজের মেয়ে বিবাহ কর নাই?"

"ঠাট্টা নহে। লিলি, তুমি মন দিয়া পড় না।"

"কাককে ঘরে পুষিয়া রাখিলে কি সে কৃষ্ণনাম করিবে? আমার বুদ্ধি নাই, আমি কি করিব?"

লীলা মুখ গম্ভীর করিল। প্রবোধ হার মানিল। প্রবোধের ঐ দুর্ব্বলতা; সে লীলার মুখ ভার বা চক্ষের জল দেখিতে পারে না। লীলা তাহা বুঝিত, তাহার বুদ্ধির অভাব ছিল না। তাহার পর দিন কতক লীলা খুব পড়িল; তাহার পরেই মাথাধরার কথা বলিতে লাগিল। কিছু দিন গেল, মাথাধরা সারিল না। তখন প্রবোধ একদিন বলিল, "পড়া বন্ধ করা ভাল।" এবার লীলার পালা,মুখ ভার করিয়া লীলা বলিল,—"তাহা হইবে না; আমি পড়িলে তুমি সুখী হও, নয় আমার মাথা ধরিলই। তুমি বড় না শরীর বড়?"

প্রবোধ বড় দায়ে পড়িল; বলিল, "তা দিন কতক বন্ধ কর।"

"না, একবার বন্ধ করিলে, আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার সময় অসুখ বাড়িবে। তার চেয়ে ধরিতে ধরিতে ক্রমে সহিয়া যাইবে। আমার মত লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল—তখন তুমি একটা ইংরাজ—"

প্রবোধ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, খোঁপা খুলিয়া দিল, মুখচুম্বন করিল, আর বইগুলা লইয়া গেল। লীলা বাঁচিল। শেলাই করিতে করিতে ভাবিতে পারা যায়, ভুল হইলে খুলিলে চলে; পড়া ছাড়িয়া লীলা শেলাই ধরিল। শেষ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া মাথা ধরে বলিয়া তাহাও ছাড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিন্তার উপর চিন্তা।

বিবাহের পর একদিন শরৎ প্রবোধের সহিত দেখা করিতে গেল। প্রবোধের মত হাস্য-কৌতুক-প্রিয় লোক দুর্লভ। প্রবোধ শরৎকে একেবারে আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। শরৎকে সেখানে বসাইয়া সে "বর বাবু এসেছেন" বলিয়া লীলাকে ধরিয়া আনিল। লীলা আসিলে শরৎ কেমন বোধ করিল। লীলাকে শরতের কাছে রাখিয়া প্রবোধ শরৎকে খাওয়াইবার জন্য মাকে বলিতে গেল। শরৎ বড় বিপদে পড়িল।

শরৎ বসিয়া, লীলা দাঁড়াইয়া; ঘর নিস্তব্ধ। শরতের মনে হইল, যেন গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য—ছবির ক্রীড়াকৌতুকিনী রমণী হইতে ভিনাসের মূর্ত্তি অবধি সকলেই—তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। শরৎ দেখিল, কিছু বলা আবশ্যক; সে লীলাকে বসিতে বলিল। লীলা শরতের ঠিক সম্মুখে চেয়ারে গিয়া বসিল; বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ কেমন হইল?" শরৎ উত্তর দিল না।

লীলার চক্ষে একটা তীব্র কটাক্ষ খেলা করিয়া গেল; তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর হাস্যাবেগে ভিন্ন হইয়া মুক্তাফলতুল্য দশনপাঁতি দেখাইল। কপালের উপর হইতে কয় গোছা চুল কর্ণপার্শ্বে দিয়া লীলা বলিল, "অত লজ্জা কেন?"

শরৎ বলিল, "তুমি ত দেখিয়াছ!

"বিবাহ করিয়া আপনি সুখী হইয়াছেন?"

শেষ কথা কয়টা বড় চাপা স্বরে উচ্চারিত হইল। শরৎ সহসা লীলার মুখের দিকে চাহিল। তখন বাহিরে দূরস্থিত হর্ম্ম্যমালার উপর হইতে তপনকিরণ নামিয়া যাইতেছে; কক্ষ-মধ্যে সামান্য অন্ধকার বোধ হইতেছে। ভাল ঠাহর হইল না; কিন্তু শরৎ ভাবিল, সে লীলার আয়ত নয়নে যেন একটু জল দেখিল।

এই সময় প্রবোধ ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল, "ছিঃ! শরৎ, এই কি কবির লক্ষণ? তোমাদের কবিতার সর্ব্বেসর্ব্বা, গীতের ঝঙ্কার, সৌন্দর্য্যের সার, চায়ের চিনি,—রমণীকে শুধু চেয়ারে বসিতে দিতে হয়? অন্ততঃ চাদরখানাও পাতিয়া দেয়? বাঙ্গালী কবি কি না! এখন, লিলি, তোমার কবি দেবর ত তোমাকে খুব সম্মান করিল, না হয় আমিই একটু সম্মান করি।" পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া প্রবোধ লীলার গায় ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

ততক্ষণে লীলা স্থির হইয়াছিল; সে বলিল, "বৌ কেমন হইয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।" শরৎ বুঝিল, কথা কয়টি বলিতে লীলাকে একটু চেষ্টা করিতে হইয়াছে। প্রবোধ হাসিয়া উঠিল, খানিকক্ষণ হাসিয়া তাহার পর বলিল, "আপ-

নার ঘোল কি কেহ টক বলে, লিলি? তাহাতে ভায়ার ত ডানাকাটা পরী জুটেছে।”

প্রবোধ একখানা চেয়ারে বসিল। লীলা শরতের খাবার আনিতে গেল।

সেই দিন বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় প্রবোধের কথা ভাবিয়া শরৎ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সান্ধ্য অন্ধকার পথময় ব্যাপ্ত; রাস্তার আলোকগুলা মিট্‌মিট্ করিতেছে; জনস্রোত অবিরাম বহিতেছে; চিন্তাস্রোত হৃদয়ে লইয়া শরৎ গৃহে ফিরিয়া চলিল। গৃহে যাইয়া নিজ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া ভাবিল; কিছুক্ষণ পরে ডায়েরী লইয়া লিখিল ঃ—

“আজ প্রবোধের কাছে গিয়াছিলাম। প্রবোধের রুচির প্রশংসা আমি কোন দিনই করি না। তাহার বসিবার ক্ষুদ্রায়তন কক্ষের হর্ম্ম্যতল হইতে ছাত পর্য্যন্ত ছবি; সে ঘরে ছয়খানা ছবি বেশ মানাইত; বাইশখানা ছবি দিয়া ঘরটাকে মাটী করা হইয়াছে। র‍্যাফেল হইতে লেটন অবধি বহু চিত্রকরের প্রসিদ্ধ চিত্র সকলের নকল; কিন্তু সেগুলার সৌন্দর্য্য উপভোগের অবসর পাওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। তবে আজ একটা ব্যাপারে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছি, কয় মাস পরে আজ প্রবোধের শয়নকক্ষে যাইয়া দেখি—কি জঘন্য রুচি! কক্ষপ্রাচীরে যে সকল চিত্র বিলম্বিত, সে সকল কি জঘন্য! ক্রীড়াকৌতুকিনী রমণীর চিত্র, মুক্তকেশ গুরু উরু স্পর্শ করি-

তেছে, চঞ্চল নয়নে বিদ্যুৎস্ফুরণতুল্য তীব্র কটাক্ষ ; সে সকল বর্ণনা করাই অসম্ভব। কক্ষের কোণে কোণে নারীমূর্ত্তি ;— সকলগুলিই অসমগ্রবসনা, কুসুমকুন্তলা, কুরুচির পরিচায়ক। যাক্, কিন্তু আমার সন্দেহ আজ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছে। আমার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহাতে প্রবোধের ভবিষ্যৎ সুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি কি করিব ?

"আমি ভাবিয়াছিলাম, কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিব না ; কিন্তু তাহা হইবে না। আমি ওকালতি পরীক্ষা দিব। প্রভাকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া আর কোথাও যাইয়া ওকালতি করিব। আমার ইচ্ছা করে, এখনই কোথাও চলিয়া যাই ; কিন্তু তাহা অসম্ভব।

"প্রবোধ অত্যন্ত সুখী, সে আপনার প্রেমসাগরে নিমগ্ন। এখনও তাহার কাছে বিহগ-কল-গীতি মধুর হইতেও মধুর, কুসুমের সৌন্দর্য্য মনোহর হইতেও মনোহর, হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা বা তারকাকুন্তলা সন্ধ্যার শোভা মনোরম, জ্যোৎস্না প্রাণমনোমোহন হইতেও প্রাণমনোমোহন। তাহার হৃদয়ে আনন্দের শত উৎস উৎসারিত রহিয়াছে। সে কিছুই বুঝে না। সাংসারিক জ্ঞান তাহার কোন দিনই নাই।

"শুভক্ষণে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, মানব-হৃদয় দুর্ব্বল।"

লীলা যে তাহাকে ভালবাসে, আজ তাহার মনে সে

সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল; শরৎ ভাবিল, প্রবোধের কাছে যাতায়াত কমাইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় শরৎ ডায়েরী শেষ করিয়া প্রথমে একখানা পুস্তক লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—ভাল লাগিল না। পুস্তক খানা ফেলিয়া যুক্ত বাহু বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া শরৎ বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল। যেরূপ রজনীতে লোকে মুক্ত-বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া, আকাশে মেঘসমাগম দেখে ও বিদ্যুৎ-কেতন ঝড়ের প্রত্যাশা করে, আজ সেইরূপ রজনী। শরৎ লক্ষ্য করিল, ম্লানচন্দ্রালোকবিভাসিত, নক্ষত্রখচিত অম্বরে এক একখানা করিয়া কৃষ্ণকায় মেঘ সমাগত হইতে লাগিল। তাহার পর নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার অম্বরে এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। সহসা একটা ঝড় উঠিয়া পাষাণপথে ধূলিরাশির ধ্বজা তুলিয়া ছুটিয়া গেল। সহসা শরতের বোধ হইল, যেন কাহার দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার কপালে পড়িল। একবার বিদ্যুৎ চমকাইল, আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হাস্যোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল! ঝড় বেগে বায়ু বহিল; বৃষ্টি আরব্ধ হইল। কক্ষমধ্যে যাইয়া হারমোনিয়ম্ যন্ত্র বাজাইয়া শরৎ গাহিল:—

হৃদে বাঁধিয়া বল
নয়ন জল
ফেল না কেন মুছিয়া!

তুমি　　অতীত কথা
হৃদয়-ব্যথা
যাও না কেন ভুলিয়া।
ওগো　　হতাশা নিয়ে
জ্বালায়ে হিয়ে
মর' না আর কাঁদিয়া ;
আর　　অমন করে'
মুখের পরে
রয়োনা আর চাহিয়া !

বাহিরে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল, দুরদূরান্তর হইতে বৃষ্টিবিন্দু তপনতাপক্লিষ্ট কুসুমকে সজীব করিতে, ম্লান তৃণরাজিকে জাগাইয়া তুলিতে, ধরণীর শ্যাম দুকূল শ্যামতর করিতে, ধরণীর উপর পড়িতে লাগিল। রুদ্ধবাতায়নপার্শ্বে পবন আর্ত্ত চীৎকার করিতে লাগিল। পবনে, গগনে, বৃষ্টিতে মাতামাতি হইতে লাগিল। আর কক্ষ মধ্যে শরতের সুমধুর কণ্ঠোদ্ভূত স্বরলহরী যন্ত্রজাত মধুর ধ্বনির সহিত মিশিয়া, কক্ষমধ্যে সুস্বরের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল।

বাহিরে বৃষ্টি ; উজ্জ্বলদীপালোকিত কক্ষে বসিয়া শরৎ গাহিতে লাগিল ; কিন্তু আজ তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, কিছুই আনন্দদায়ক হইতেছিল না। পুস্তকপাঠ ছাড়িয়া শরৎ বেড়াইতে গিয়াছিল, তাহার পর আসিয়া গাইতে বসিয়াছিল ;

আবার উঠিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়া গেল; বর্ষণক্ষান্ত মেঘমালার উপর ম্লান চন্দ্রালোক পতিত হইল; শীকরশীতল পবন বহিতে লাগিল।

সেই রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া শরৎ ভাবিতে লাগিল। প্রভা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শরৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন। কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি যুবতীর বড় প্রবল; পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া প্রভা শরতের বামস্কন্ধের উপর সহসা আপনার বামকর স্থাপন করিল। শরৎ চমকিয়া চাহিল—প্রজ্বলিত দীপের আলোক পত্নীর হাসিমাখা মুখে খেলা করিতেছে, চঞ্চল পবন তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত-কুন্তলজালে খেলা করিতেছে; শরৎ উঠিয়া পত্নীকে বাহুপাশ-বদ্ধ করিয়া তাহার উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আনন অসীমআবেগময় চুম্বনের পর চুম্বনে প্লাবিত করিয়া দিল। শরৎ পত্নীকে আরও হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইল—যেন কেহ কখনও তাহাদের প্রেমবন্ধন শিথিল করিতে না পারে। শরৎ প্রভাকে অতিশয় ভালবাসিত, তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার পক্ষে জগৎ শোভা-ময়, মাধুরীময় হইয়াছিল।

প্রভা বলিল, "কি ভাবিতেছ?"

শরৎ বলিল, "ও কিছু নহে; চল, শয়ন করি।"

প্রভা স্বামীর কথায় দ্বিরুক্তি করিত না।

সে রাত্রিতে শরৎ বড় ঘুমাইতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুঃখ কেন ?

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল ; শরৎ শুকাইতে লাগিল। কেহ কিছু বলিলে বলিত, "পরীক্ষার ভাবনা।" প্রভা চিন্তিতা হইল। স্ত্রী যেমন করিয়া স্বামীর সকল খুঁটি নাটি লক্ষ্য করে, স্বামী স্ত্রীর খুঁটি নাটি সকল সময় সেরূপে লক্ষ্য করে না। প্রভা লক্ষ্য করিল, শরৎ তাহাকে ক্রমেই অধিক যত্ন করিতেছে ; তাহার সামান্য অসুখে, সামান্য চিন্তাম্লানবদন-দর্শনে তাহার স্বামী ব্যস্ত হইয়া পড়েন। স্বামী কি তবে তাহাকে কেবল যত্ন করিতে-ছেন ? তাঁহার ভালবাসার কি হ্রাস হইয়াছে ? ছিঃ ! সে কথা ভাবিলেও পাপ, প্রভা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কোন্ স্ত্রী ইচ্ছা করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে যে, তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসেন না ? ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী রমণী তাহা সহজে বিশ্বাস করিলে, এই পাপ পুরুষজাতির কি উপায় হইত, বলিতে পারি না। প্রভা সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে লীলার সহিত প্রভার কয় বার সাক্ষাৎ হই-য়াছে ; লীলা প্রভার সহিত বড় গর্ব্বিতভাবে আলাপ করি-

য়াছে। গহনার কথা, কাপড়ের কথা, আপনার পিত্রালয়ের গৌরবের কথা, প্রভার সহিত লীলা এই সকল আলাপ করিয়াছে। তাহার বস্ত্রালঙ্কারের গর্ব্ব, পিত্রালয়ের গর্ব্ব, প্রভার ভাল লাগিত না। কিন্তু প্রভা বড় ধীরা, বড় বিনয়বতী; প্রভা নীরবে সকল শুনিত; উত্তর দিত না। লীলা এই সকল লইয়া দুই একবার প্রভাকে দুই একটা মর্ম্মভেদী কথা বলিয়াছে। হায়, রমণী, তুমিই জান, কেমন করিয়া এমন আঘাত দিতে হয়! রমণীর কথায় তীব্র হলাহল আছে; তাহার যাতনার তুলনায় পুরুষের তীব্রতম কটু ভাষাও মিষ্ট বোধ হয়। হয় ত কোমলে আমরা কঠোরতা প্রত্যাশা করি না; তাই রমণীর এই আঘাত এত ভীষণ মনে করি; হয় ত বা সত্যই সে আঘাত অত্যন্ত ভীষণ। আবার রমণী অন্য রমণীর হাসি চাহনি হইতে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত সকল যেমন করিয়া লক্ষ্য করে, পুরুষ অন্য পুরুষের সে সকল তেমন করিয়া লক্ষ্য করে না। লীলার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া প্রভা ভাবিল, ইহাতে একটা বিশেষ রহস্য আছে। লীলা যখন তাহাকে বিদ্রূপ করে, তখন তাহার মুখ সহসা গম্ভীর হয়, যেন বসন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশে সহসা মেঘসমাগম হয়; লীলা যখন তাহার কোন কথায় হাসে, তখন সহসা তাহার চক্ষে জল আইসে; যেন রবিকরে উন্মেষিত কুসুমের বুকে শিশিরবিন্দু টল টল করে!

লীলা তাহার সহিত যখন যেরূপ ব্যবহার করিত, প্রভা

সকলই স্বামীকে বলিত; লীলা তাহাকে যে সকল কথা বলিত, প্রভা সে সকলই স্বামীকে বলিত। শরৎ বুঝিল, লীলা ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। শরৎ ব্যথিত হইল। প্রভা বিস্মিতা ও বিষাদিতা হইল। শরতের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; এরূপ ব্যাপারে যাহারা বিজড়িত থাকে, তাহাদের কিছু চিন্তিত হইবারই কথা। দুই একবার ইহাও শরতের মনে হইয়াছে যে, লীলা যদি তাহাকে বিবাহ করিতে পাইত, তবে হয় ত লীলার হৃদয়ে এ চিন্তা, এ যাতনা স্থান পাইত না। কিন্তু লীলা কি তাহাকে প্রভার মত করিয়া আপনার ভাবিতে পারিত?

শরতের অভাব ছিল না; কান্ত রূপ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য, গভীর জ্ঞান এবং এ সকল অপেক্ষা যাহা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান্, সেই প্রেমময়ী পত্নী তাহার ছিল। তাহা ভিন্ন তাহার সুখ যেন সম্পূর্ণ করিতেই, তাহার স্নেহময়ী জননী ও স্নেহশীল ভ্রাতা তাহাকে আপনাদিগের বিপুল স্নেহ-রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। শরতের অভাব ছিল না, অন্য কেহ হইলে ইহাতে তাহার সুখেরও অভাব হইত না; কিন্তু শরৎ কিছু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। লীলার কথা তাহার সর্ব্ব সুখের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল। প্রবোধ ও লীলার কথা ভাবিয়া শরৎ বড় বিষণ্ণ হইল।

শরতেরও অভাব ছিল না, লীলারও অভাব ছিল না।

লীলা অসাধারণ রূপবতী, ধনীর গৃহিণী, পতিসোহাগিনী। সধবা রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ, পতির প্রেম হইতে বঞ্চিতা হওয়া ; আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ, পতিসোহাগিনী হওয়া। এখানে আর একটা কথা আসিয়া পড়ে ; প্রেমে ও যত্নে যথেষ্ট প্রভেদ। পতি অন্য রমণীকে ভালবাসিলে বা পত্নীকে ঘৃণা করিলে, পত্নী পতির প্রেমে বঞ্চিতা হয়েন ; তাহাতে অনেক সময় প্রেম ও যত্ন উভয়ই যায়। কিন্তু আর এক কথা আছে ; প্রেম সুখের অসীমতা ; শ্রদ্ধা সুখ ও প্রেমের মূল ; প্রেম সুখের সমীচীন স্বপ্ন, শ্রদ্ধা তাহার ভিত্তি। শ্রদ্ধার বিলোপ সাধিত হইলে, প্রেমও লোপ পায়। এইরূপে প্রেম লোপ পাইলে যত্ন লোপ পায় না। অনেক সংসারে দেখিবে, সংসার বেশ চলিতেছে, পত্নীর মাথা ধরিলে পতি ব্যস্ত হইয়া পড়েন, পত্নীর সামান্য পীড়ায় পতি চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আনাইতেছেন ; কিন্তু পতি পত্নী কাহারও মুখে হাসি নাই, হৃদয়ে প্রেমের অরুণরাগ নাই ; সবই আছে, অথচ কিছুই নাই ; দেহ আছে, প্রাণ নাই : সঙ্গীত আছে, তাহার মোহিনী শক্তি নাই ; কুসুম আছে, তাহার সৌরভ নাই। যে রমণী পতির প্রেমে বঞ্চিতা হইয়া কেবল পতির যত্ন প্রাপ্ত হয়, সেও দুঃখিনী। যে রমণী পতির প্রেম পায়, সেই সুখিনী ; লীলা স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছে ; তাহারও অভাব নাই ; তবুও তাহার সুখ নাই।

তবু লীলা শুকাইতে লাগিল। সরসীসলিলে শরৎসোহাগিনী সরোজিনী শীতবাতস্পর্শে যেমন শুকাইয়া যায়, লীলা তেমনই শুকাইতে লাগিল। চিকিৎসক দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু রোগনির্ণয় হইল না, রোগও সারিল না। এক দিকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অন্যদিকে প্রেম; এক দিকে সকল সাংসারিক সুখ, অন্য-দিকে সর্ব্বনাশ! তাহার হৃদয় যে প্রবল বাত্যায় তরঙ্গময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি ঔষধে নিবারিত হয়? লীলা একবারও ভাবে নাই যে, সে প্রবোধের নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হইবে; কিন্তু শরৎ ত বলিয়াছে, প্রণয়ে পাপ নাই!

একদিন সে একখানা পুস্তক পড়িতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রবোধ তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। লীলা হাসিয়া প্রবোধের গায় পড়িল। প্রবোধ লীলার চক্ষু ছাড়িয়া মুখ ধরিয়া তুলিয়া চুম্বন করিল। সহসা লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

প্রবোধ কিছু অবাক্ হইল;—বলিল, "কেন?"

মুখ ভার করিয়া লীলা বলিল, "জিজ্ঞাসা করিলে দোষ হয়?"

প্রবোধ বিপদে পড়িল—বলিল, "তা আবার জিজ্ঞাসা কেন?"

"প্রণয়ের অপেক্ষা পবিত্র কিছু আছে?"

প্রবোধ ভাবিল, বুঝি পুস্তকে কোথাও কি আছে। সে

বলিল, "প্রণয় পবিত্র, প্রণয়ের ধ্বংস নাই; এক জন ইংরাজ কবি বলেন, They sin"—

"আমি ত ছাই ইংরাজী বুঝি না।"

"তুমি শিখিলে না কেন?"

"তুমিই ত বই লইয়া গেলে!"

প্রবোধ হার মানিল।

সেই দিন প্রবোধের কথায় হুতাশনে ঘৃতাহুতি পড়িল।

শেষ ডাক্তার ছাড়াইয়া লীলাকে কবিরাজ দেখান হইল! কবিরাজ ঔষধ দিলেন—লীলা ঔষধ রাস্তায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর গৃহের মহিলারা বুঝিলেন, লীলার সন্তান হইবে। আর তাহার কৃশতায় কেহ মনোযোগ করিল না। প্রবোধ বুঝিল, এখন সব মেয়েই অমন হয়, শীঘ্রই পুরাতন-পত্রাপগমান্তে নবকিশলয়দলভূষিতা, কুসুমকোরকশোভিতা লতিকার ন্যায় পুত্রবতী লীলার দর্শনাশায় সে আনন্দিত হইল। নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগে লীলাও কিছুদিন অন্য ভাবনা ভুলিল। সন্তানলাভলালসা স্ত্রীলোকের বড় প্রবল। যে রমণী সন্তানবতী হইতে আকাঙ্ক্ষা না করে, সে হয় দেবী, না হয় পিশাচী। বন্ধ্যা নারী বড় দুঃখিনী।

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল; লীলা শুকাইতে লাগিল, শরৎ শুকাইতে লাগিল, প্রভা ভাবিতে লাগিল—দিনও দাঁড়াইয়া রহিল না, দিন কাটিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্ধনের উপর বন্ধন।

বিবাহের পর প্রবোধ কলেজ ছাড়িয়া দিল। শরৎ আইনের পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিল। প্রবোধ প্রায়ই শরতের কাছে যাইত; কারণ, শরতের কাছে নহিলে আর কোথাও প্রাণ ভরিয়া "লিলির" কথা বলা হইত না। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল—ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটিল।

প্রবোধের বাটীর পশ্চাতে অনেকটা জায়গা ছিল; তাহাতে একটা ছোট পুষ্করিণী ছিল। চারি দিকে ফুলের বাগান; মধ্যে স্বচ্ছসলিলা উদ্যানপ্রহ্লাদিনী পুষ্করিণী। স্ফটিকসলিলরাশি মৃদু পবনে মৃদু মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া পাহাড়ের শ্যাম দূর্ব্বাদল চুম্বন করিত। প্রায় কূলে কূলে ভরা জল থই থই করিতেছে—তাহার উপর অল্পদূরবিস্তৃত নিম্নভূমি শ্যামদূর্ব্বাদলে মণ্ডিত; তাহার পর চারি দিক বেষ্টিত করিয়া লোহিতবর্ণ পথ; পথি-পার্শ্বে বিচিত্র-বর্ণ-বৈচিত্র্য-বহুল পাতা-বাহারের সারি—নানা আকারে ছাঁটা; তাহার পরে তৃণমণ্ডিত ভূমি; স্থানে স্থানে বাগান বাহারে ঘেরা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত প্রভৃতি নানা আকারে রচিত স্থানে ঋতুকুসুমের উজ্জ্বল বর্ণ-বৈষম্যে চক্ষু ঝলসিয়া যায়—লোহিত, শ্বেত, পীত, নীল, নানাবর্ণ; মধ্যে

মধ্যে গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছ—আর লতাবল্লীবিনির্ম্মিত কুঞ্জ—তাহাতে কত ফুলই ফুটিয়াছে! প্রাচীরপার্শ্বে বেল, যুঁই, মল্লিকার সারি। এক পার্শ্বে একটা চৌবাচ্চা, চারিটি থামের উপর গম্বুজাকৃতি ছাদ। সেই চৌবাচ্চার জলে শ্বেত ও লোহিত মৎস্য সকল খেলা করিতেছে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও শৈবালদলের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। পুষ্করিণীর জলে একখানা বোট ফেলা, ব্যবহারের অভাবে তাহা শৈবালসমাচ্ছন্ন।

অন্তঃপুরে উদ্যান;—মেয়েরা কোন কোন দিন প্রভাতে বা সন্ধ্যাকালে সেখানে বেড়াইতেন; এক একদিন সখ করিয়া বাঁধাঘাটে স্নানও করিতেন। ছেলেরা বাগানে ছুটাছুটি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, প্রজাপতি ধরিত, আর প্রবোধের মাতার ও জ্যেষ্ঠভ্রাতপত্নীর পূজার ফুল তুলিত। লীলা সে উদ্যানে বেড়াইতে ভালবাসিত; প্রবোধের ভ্রাতৃজায়ার সহিত মধ্যে মধ্যে সে সেই বিততবহুবল্লীনবপল্লবঘন উদ্যানে বেড়াইতে যাইত। দুই জনে কোথাও বসিতেন। চলবন-পবন-সুরভি-শীতল উদ্যানমধ্যে প্রবোধের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রকন্যাগণ খেলা করিত, যেন কুসুমরাশির মধ্যে মধুরতর কুসুমরাশি। প্রবোধের ভ্রাতৃজায়া মুগ্ধনেত্রে সন্তানগণের ক্রীড়া দেখিতেন, কোন্ জননী সন্তানগণকে দেখিতে বাসনা না করেন? লীলাও দেখিত বা দেখিবার ভাণ করিত। কোন দিন হয় ত

প্রবোধের জননী তাহাদের সঙ্গে আসিতেন, কোন দিন বা প্রবোধ আসিত। প্রবোধের জ্যেঠাইমা এ সব ভালবাসিতেন না।

বহুদিন পরে একদিন অপরাহ্নে শরৎ প্রবোধের নিকট আসিল। দুই জনে বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় বাটীর মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল। প্রবোধের জ্যেষ্ঠ তখন গৃহে ছিলেন না। প্রবোধ গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইবে, এমন সময় একজন চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পুষ্করিণীর তীরে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে প্রবোধের জ্যেষ্ঠের এক পুত্র জলে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রবোধ ও শরৎ ছুটিয়া পুষ্করিণীর তীরে গেল। বাটীর মহিলাগণ, চাকরচাকরাণীরা সকলেই পুষ্করিণীর পাহাড়ে দাঁড়াইয়া। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। অনেকে সন্তরণাপটু। যাঁহারা পটু, তাঁহারাও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। শরৎ একবার চারি দিকে চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ডুবিয়াছে?" আট দশ জন একত্র চেঁচাইয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তাহার পর প্রত্যুৎপন্নমতি যুবক মুহূর্ত্ত মধ্যে চাদর, জামা, জুতা, ফেলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল; যেখানে বালক ডুবিয়াছিল, সেখানে ডুব দিতে লাগিল। সে কয় বার ডুব দিল; সকলে সাগ্রহে আশা ও আশঙ্কাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। একবার শরতের উঠিতে বড় বিলম্ব হইল, সকলের

মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তাহার পর শরৎ উঠিল; নিমগ্ন বালকের কেশ ধরিয়া সন্তরণ দিয়া আসিয়া শরৎ কূলে উঠিল। উঠিয়া যেমন করিয়া জলনিমগ্নকে বাঁচাইতে হয়, তেমনই করিল। বালক বহুক্ষণ ডুবে নাই; অল্পক্ষণ পরেই তাহার শ্বাস বহিতে লাগিল। তখন বালকের মস্তক অঙ্কে তুলিয়া শরৎ তৃণাসনে বসিল।

অপরাহ্নের ম্লানতেজা তপন তাহার ব্যায়ামাভ্যস্ত, পরিশ্রমসহিষ্ণু, পরিপূর্ণ, অনাবৃত দেহের উপর আপন কিরণরাশি ঢালিয়া দিল। আমরা শ্রম করি না, কেবল সুচারু অঙ্গাবরণে আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও বিকলাঙ্গতা আবৃত করিয়া রাখি; আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা সন্তানদিগকে পৈতৃক সম্পত্তিরূপে দিয়া যাই। শরৎ তৃণাসনে বসিয়া রহিল। তাহার স্থানচ্যুত সিক্ত কেশজাল তাহার ঊর্দ্ধোন্নত কপালে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছে। সান্ধ্য সমীরণে সরসীর স্বচ্ছ সলিলে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, বৃক্ষ লতায় মর্ম্মরধ্বনি উঠিতে লাগিল, উদ্যানমধ্যে বিহগকাকলি শ্রুত হইতে লাগিল, আর শরতের ক্রোড়-ন্যস্তমস্তক বালকের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় প্রবোধের জ্যেষ্ঠ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন বালক সুস্থ হইয়া উঠিতেছে; শীতল বাতাসে সিক্ত

বস্ত্রে শরতের অসুখ হইতে পারে বলিয়া তিনি বালককে লইলেন। শরৎ বলিল, তাহার প্রত্যহ দুইবার স্নান অভ্যাস আছে, অসুখ হইবে না। তাহার পর সে বেশপরিবর্ত্তন করিতে গেল। প্রবোধের জ্যেষ্ঠ শরৎকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। গৃহে সকলেই শরতের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সে দিন গৃহে ফিরিতে শরতের বিলম্ব হইল। দাদা শুনিয়া বলিলেন, "শরৎ সবই পারে। কেবল মাঝে মাঝে কবিতারোগের বাড়াবাড়ি হইলেই তা'র সব গোল হইয়া যায়।"

শয়নকক্ষে প্রভার নিকট শরৎকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে হইল। প্রভার আয়ত লোচন বিস্ময়ে, প্রশংসায়, আনন্দে, এক নূতন চঞ্চল প্রভাময় হইয়া উঠিল। প্রভার ধারণা ছিল যে, সে দেবোপম স্বামী পাইয়াছে। প্রভার ধারণা ভ্রান্ত কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। সে তাহার বিশ্বাস লইয়া সুখে আছে। প্রভা কখনও কাহারও নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করে নাই; কিন্তু সে মনে মনে গর্ব্বিত ছিল যে, তাহার স্বামীর মত স্বামিলাভ সকল রমণীর ভাগ্যে হয় না। সব শুনিয়া প্রভা প্রথমে অবাক্‌-নেত্রে শরতের দিকে চাহিল; তাহার পর তাহার কেশের বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া চিরুণি ব্রাশ লইয়া কেশের পারি-পাট্যসাধনে নিযুক্ত হইল। প্রবোধদের গৃহে বেশপরিবর্ত্তন-

বিপত্নীক।

কালে শরৎ কেশের পারিপাট্যসাধনের অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

সকলেই শরতের প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিল। শরতের কার্য্য দেখিয়া লীলা অবাক্ হইল। রমণী নারী-প্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ অপেক্ষা পুরুষপ্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষকে অধিক শ্রদ্ধা করে। স্বয়ংবরে বীর বাছাই তাহারই পরিচায়ক। পুরুষ কোমলতার আদর করে; আর রমণী কঠোরতার পূজা করে। পুরুষের বিশেষ অধিকার, পুরুষের প্রাধান্যের প্রধান কারণ, শারীরিক বল (পৈশাচিক বল বলিতে হয় বল) যে রমণীহৃদয়ে প্রভাব সংস্থাপন করে, তাহা নিশ্চয়। লীলার হৃদয়ে বাঁধনের উপর বাঁধন পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দূরে।

"উঠ লিলি, বেলা হইয়াছে। আজ শরৎদের বাটীর সকলে আসিবেন।"

শেষ মাঘের নাতিশীতোষ্ণ পবন বহিতেছে, অরুণকিরণ মুক্ত বাতায়ন-পথে পালঙ্কোপরি শয়ানা রমণীর মুখমণ্ডলে ও তাহার আলুলায়িত, মার্ব্বলমণ্ডিতহর্ম্ম্যতলস্পর্শী কৃষ্ণকুন্তল-জালের উপর পড়িয়াছে, যেন জ্যোতিশ্ছটায় কোন অলৌকিকী সুন্দরীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে। পবন নাতিশীতোষ্ণ, তথাপি সুন্দরীর কৌমুদীপ্রতিমবর্ণ ললাটে স্বেদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; চূর্ণকুন্তলজাল স্বেদজড়িত হইয়া কপালে বদ্ধ হইয়া আছে। নয়ন মুদিত, যেন কমলকোরক আপনার মুদিতহৃদয়ে শত স্বপ্ন লইয়া কুসুমজীবনের বিকাশাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু লীলা ঘুমায় নাই; সে কি ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?

প্রবোধের সম্বোধনে লীলা চমকিয়া উঠিল; উঠিয়া চুলগুলা গুছাইয়া তুলিয়া চক্ষু মুছিল। চক্ষের পার্শ্বে বৃত্তাকারে কালিমা পড়িয়াছে, সেই অমলশ্বেত বদনে তাহা সহজে লক্ষিত হইতেছে। সে ভরা গালে এখন দুই গণ্ডে অস্থি দেখা

যায়। লীলা কৃশাঙ্গী হইয়া গিয়াছে ; সন্তানসম্ভবারমণীসুলভ দুর্ব্বলতায় লীলার গাত্রে নীল শিরা দেখা যাইতেছে।

শরতের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; শরৎ পূর্ব্বসঙ্কল্প মত পশ্চিমে ওকালতি করিতে যাইতেছে; আজ রাত্রে সে প্রভাকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিবে। প্রবোধদের গৃহে আজ শরতের গৃহের মহিলাগণের নিমন্ত্রণ।

এবার শরৎ কাহারও কথা শুনে নাই। মা অনেক বারণ করিলেন, দুই এক ফোঁটা অশ্রুও বর্ষণ করিলেন, শরৎ শুনিল না। দাদা তাহার "বিদেশে" ওকালতি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎ উত্তর দিতে চাহিল না—বসন্তকুমার বুঝিলেন, আর পীড়াপীড়ি করা নিষ্ফল। যাত্রার আয়োজন স্থির হইল; শরতের এক দূরসম্পর্কীয়া পিতৃষ্বসা তাহার সহিত যাইবেন, স্থির হইল।

শরতের জননী, ভ্রাতৃজায়া ও প্রভা সেদিন প্রবোধদিগের গৃহে আসিলেন। লীলা আবার প্রভার সহিত গর্ব্বোদ্ধতভাবে আলাপ করিল; কিন্তু প্রভা আজ একটা বিষয় লক্ষ্য করিল। প্রভা দেখিল, লীলা যখন তাহার শাশুড়ী ও যার সহিত আলাপ করে, তখন সে অত্যন্ত বিনয়ী; কিন্তু তাহার সহিত আলাপ করিবার সময় সে গর্ব্বিতা। প্রভা ভাবিল, একি? যে গর্ব্বিত হয়, সে কি কখনও বিনয়ী ও সরল হয়, আবার কখনও গর্ব্বিত হয়! না লীলার চরিত্রে উভয়ই মিশ্রিত?

আবার লীলা যখন তাহার সহিত কথা কহে, তখন সে বড় সতর্ক হইয়া কথা বলে; কথাগুলা যেন সরল—স্বাভাবিক নহে! প্রভা ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিল।

এদিকে সমস্ত দিন শরতের বন্ধুবান্ধবগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। সকলেই জানিতেন, শরৎ যাহা করিবে স্থির করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব।

দিন কাহারও জন্য দাঁড়াইয়া থাকে না। ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে বিগততেজ কিরণগোলক মিশাইয়া গেল; হর্ম্ম্যমালার দীর্ঘ ছায়া সান্ধ্য অন্ধকারে মিশাইয়া গেল; আকাশে তারকারাজি জ্বলিতে লাগিল। শরতের যাইবার সময় হইয়া আসিল। প্রভা পূর্ব্বদিন পিত্রালয় হইতে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিল; তবুও আজ সকলের জন্য তাহার কেমন কষ্ট হইতে লাগিল। দূরে যাইতে সহজেই মনে হয়—কি হইবে,না জানি কি হইবে! যাহাদের যেমন রাখিয়া যাইতেছি, আসিয়া তাহাদের তেমনই দেখিতে পাইব কি? যেমন রাখিয়া যাও, আসিয়া তেমন দেখিতে পাও কি? কত জনের সহিত আর দেখা হইবে না, কত জন আর তেমন নাই,—কত জন তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! যখন গিয়াছ, তখন যে বালকবালিকারা তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, যখন ফিরিয়াছ, তখন তাহাদিগের সহিত নূতন করিয়া

আলাপ. করিতে হইয়াছে! যাহার দর্শনাশায় দিন গণিয়া মরিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে, যে তোমার অদর্শনে "মেঘলায় স্থলনলিনী মত" শুকাইতেছে, হয় ত সাক্ষাৎ হইলে তাহার সহিত বলিবার কথা খুঁজিয়া পাও নাই!

কোমলপ্রাণা প্রভা কেন, দৃঢ়সঙ্কল্প শরৎও আজ যাইবার সময় মাতার নয়নে জল দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মাতা অশ্রুসংবরণ করিলেন; কিন্তু শরৎ পারিল না।

প্রবোধ ও বসন্তকুমার, শরৎ, প্রভা, শরতের পিতৃস্বসা ও দুই জন ভৃত্যকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া নির্ব্বাপিতদীপ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রবোধ লীলাকে ডাকিয়া উত্তর পাইল না। দীপ জ্বালিতে দেশলাই খুঁজিল, পাইল না; তাহার পর সে শয়ন করিল—লীলা পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল। লীলা কি ঘুমাইতেছিল?

বসন্তকুমার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যা তখনও কাঁদিতেছে,—তাহারা কাকা কাকা করিয়া পাগল।

লীলা দিন দিন কৃশা হইতে লাগিল; কিন্তু সন্তানলাভাশায়, নূতন জীবনের আশায়, সে আনন্দিতা হইল। স্বামীর ভালবাসা, সম্মান এবং সন্তান, এই তিন সকল স্ত্রীলোকই প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। স্বামীর ভালবাসা ও সম্মান

লীলা পাইয়াছে, এখন তাহার সন্তানলাভসম্ভাবনা হইয়াছে। জননীত্ব রমণীজন্মের পূর্ণত্ব; তাহাতেই রমণীর সম্পূর্ণ বিকাশ। জননীত্ব রমণীর বিশেষ অধিকার, আর জননী বলিয়াই রমণী স্নেহময়ী, দয়াময়ী, রমণী রমণী। সংসারের সকল সৌন্দর্য্যের সার সন্তান; সন্তানহীন সংসার মরুতুল্য; রমণীহীন সংসার সংসারই নহে। জীবনের পূর্ণত্বপ্রাপ্তির আশায় লীলা আনন্দিতা হইল। লীলা আনন্দিতা হইল, প্রবোধও আনন্দিত হইল।

শরৎ চলিয়া গেল।

দিন যাইতে লাগিল; মাস যাইতে লাগিল; বৃক্ষ লতায় ফুল ফুটিল, ফুল ঝরিল, ফল শোভা পাইল, ফলও ঝরিল—নূতন বৃক্ষলতা উৎপন্ন হইল। জগতে পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

মধ্যাহ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখ।

শরৎ কলিকাতা হইতে আসিবার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার স্ফুট চন্দ্রালোকে প্রকৃতি হাসিতেছে; জ্যোৎস্নাঞ্চলপরিহিতা সন্ধ্যার শোভা বড় মনোরম। সহরের বাহিরে যে গৃহে শরৎ বাস করে, সেখানে প্রকৃতির শোভা বড় সুন্দর। আজ কলধৌত প্রবাহবৎ চন্দ্রালোকে চারি দিকে বন্ধুর ভূমি নদীর তরঙ্গভঙ্গের মত দেখাইতেছে; দূরে শৈল-মালা মেঘবৎ দৃষ্ট হইতেছে; প্রান্তরমধ্যস্থ বৃক্ষে খদ্যোতকুল তারকারাশির মত জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে; অদূরস্থিত নির্ঝরের রব শ্রুত হইতেছে; গৃহপ্রাঙ্গনে রাশি রাশি কুসুম নয়ন মেলিয়াছে।

শরতের গৃহ সুসজ্জিত। গৃহ বৃহৎ; গৃহবাসীদিগের সংখ্যা অল্প। গৃহের নিম্নতলে শরতের বসিবার একটা ঘর; মক্কেলগণ সেখানে বসে। আর ঘরগুলা ভৃত্যদিগের অধিকারে। দ্বিতলে পিসীমার অধিকার। ত্রিতলে শরতের পুস্তকাগার, শয়নাগার, সাধারণ বসিবার ঘর প্রভৃতি; সেখানে প্রভার অধিকার। সহ-রের কোলাহল হইতে অল্প দূরে, শরৎ এই গৃহে বাস করে।

বিপত্নীক।

তাহার প্রতিভা আছে, শ্রমক্ষমতা আছে—সাফল্য হইবে না কেন?

আজ সন্ধ্যাকালে সেই গৃহের ত্রিতলে দক্ষিণে একটা মুক্ত ছাদে বসিয়া শরৎ সম্মুখে চাহিয়া দেখিতেছে, দূরে একটা পাহাড়ে বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মেঘ-মধ্যে স্থির বিদ্যুতের মত পর্ব্বতোপরি হুতাশন জ্বলিতেছে; যেখানে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চারি পার্শ্বে কিছু দূর পাহাড়ের বৃক্ষলতাদি ও প্রস্তরশয্যা দেখা যাইতেছে। আর সব অস্পষ্ট। বোধ হইতেছে, যেন একটা জ্যোতির্ম্ময় উরগ পড়িয়া আছে। শরৎ তাহাই দেখিতেছে।

এমন সময় প্রভা আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সেই হুতাশনশোভা দেখিল। শরৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রভার মুখখানা বড় গম্ভীর; শরৎ বুঝিল, কিসে প্রভা ব্যথিতা হইয়াছে—প্রভা বড় অল্পে ব্যথা বোধ করিত। শরৎ পার্শ্বের একখানা চেয়ারে প্রভাকে বসাইল; বসাইয়া বলিল, "আজ মুখ আঁধার কেন?"

প্রভা বলিল, "তুমি আমায় সব কথা বল না কেন?"

"কি বলি নাই?"

"—পত্রে তোমার যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ত আমায় দেখাও নাই?"

"ভুলিয়া গিয়াছিলাম, প্রভা।"

"তুমি কি আমায় আর ভালবাস না? আমি কি দোষ করিয়াছি?" প্রভার নয়নে ভীতিভাব; প্রভা বড় কোমলা, বড় ভীতা।

শরৎ বলিল, "ছিঃ প্রভা, অমন ভাবিতে নাই।"

বাতাসে প্রভার মাথার কাপড় উড়িয়া ঘাড়ের উপর পড়িল। শরৎ প্রভার মুখখানি উচু করিয়া তুলিল; তাহার হাতে দুই ফোঁটা জল পড়িল। প্রভা কাঁদিয়াছে। শরৎ বলিল, "প্রভা, কাঁদিতেছ কেন?"

প্রভা বলিল, "আমার বড় কেমন বোধ হয়। তুমি আমার কথা ভুলিলে বড় কষ্ট বোধ হয়।"

শরৎ বলিল, "চল, ঘরে যাই; অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তোমাকে একটা নুতন কবিতা শুনাইব।"

"কি কবিতা?"

"চল, শুনিবে।"

"চল", বলিয়া প্রভা উঠিল; কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে বসিল। মুক্ত বাতায়নপথে কুসুমসৌরভভারকাতর পবন আসিয়া আলোকোজ্জ্বল কক্ষমধ্যে প্রভার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। জামার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া শরৎ পড়িল,—

কে তুমি ঢেলেছ হৃদে আকুল প্রেমের ধার!
আপনার প্রেম দিয়া

বিপত্নীক।

ভরেছ এ শূন্য হিয়া,
প্রেমের আলোক দিয়া
ঘুচায়েছ অন্ধকার!

কাতর হৃদয়তলে
যে হতাশা-চিতা জ্বলে,
প্রেমের জাহ্নবী-জলে
নিবায়েছ শিখা তা'র!

ও প্রেম মলয় বায়
হৃদয়ে বহিয়া যায়,
ফুটি' উঠে হৃদে তা'য়
আনন্দ-কুসুমভার!

এ কাতর হৃদাকাশে
প্রেম ধ্রুব-তারা হাসে,
আশার সলিলে ভাসে
মধু প্রতিবিম্ব তা'র!

নিরাশা শ্মশানস্থল
ধুয়েছে আশার জল,
আশার নবীন বল
ঘুচায়েছে হাহাকার!

ও মধু সৌন্দর্য্যরাশি
হৃদয়েতে উঠে ভাসি',
ওই মুখ, ওই হাসি
হৃদে জাগে অনিবার !
কে তুমি ঢেলেছ হৃদে আকুল প্রেমের ধার !

নৈশ গগন প্লাবিত করিয়া প্রান্তরে তরুশাখাসীন কোকিল গাহিয়া উঠিল, পবনবাহিত হইয়া সে গীত মধুরতর হইয়া আসিল। সেই নৈশগগনপ্লাবিনী স্বরলহরী, সেই শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী, সেই গগনবক্ষ হইতে নক্ষত্রবধূর পৃথিবীসংলগ্ন সলজ্জ দৃষ্টি, সেই নির্ঝরকলনাদ-বাহী কুসুমসুরভিভার-কাতর পবন, আর প্রভার সেই প্রেমদীপ্ত অমলকমলদললোচন; শরৎ ভাবিল, এ সকলই সেই এক অসীম শোভার অংশ। শরৎ সেই শোভা উপলব্ধি করিল; বলিল,"প্রভা, বিহগের গীত শুনিলে ? ঐ যে বিহগ গান গাহিতেছে, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্ব সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের সার প্রেমই উহার হৃদয়কে প্রাণময় প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতে পরিণত করিতেছে।" প্রভা প্রেমদীপ্ত আয়তলোচনে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

দুই জনে আসিয়া বাতায়ন-সম্মুখস্থ একখানা সোফায় বসিল। স্বামীর স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া প্রভা জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত গগনের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে

চাহিয়া প্রভা বলিল, "আমরা দুই জনে কেন ঐ অনন্ত অম্বরে যুগল তারকা হই নাই—যাহারা পরস্পরের দিকে অনিমিষে চাহিয়া থাকে; পরস্পরের প্রেমবিনিময়ে হৃদয় সুখদীপ্ত করে; আর পরস্পরকে দেখিয়া আত্মহারা হয়?"

শরৎ বলিল, "কেন প্রভা, আমাদের সুখ কি কম?"

"কই আমি ত তাহা বলি নাই!—আমরা তারা হইতে পারিতাম না।"

"কেন?"

"তাহারা সবাই সমান।"

"আর আমরা?"

"আমরা কি সমান? তোমাদের দৃঢ়বাহু আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আমরা কোথায় থাকি? তোমরা আমাদের হৃদয়ে তোমাদের অসীম প্রেম দিয়াই ত আমাদের হৃদয় প্রেমোজ্জ্বল ও সুখময় কর। আমরা কি তোমাদের সমান?"

"তোমরা প্রথম হইতে আমাদের উপর নির্ভর করিয়াছ। তোমাদিগের কোমলতায় আমাদিগের তাপদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিয়াছ। তাই আজ আমরা তোমাদিগকে আমাদের অপেক্ষা হীন ভাবি। আমাদের মত গর্ব্বান্ধ, স্বার্থপর আর নাই।"

"কে বলে?"

"অনেকেই বলেন যে, প্রকৃতি শিক্ষার দাস। পুরুষের মত শিক্ষা পাইলে কালে তোমরাও আমাদের সমান হইতে পার।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "যে বলে বলুক, আমি আপনাকে তোমার অপেক্ষা হীন ভিন্ন কিছুই ভাবিতে পারি না?"

"শুন –"

"না, ও কথায় কাজ নাই। আমি তোমার সমান নহি।"

প্রভার মুখ তুলিয়া শরৎ তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "কই প্রভা, বই আন।"

প্রভা পুস্তক আনিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের অন্তরায়।

লীলার যখন একটি কন্যা হইল, তখন লীলা ও প্রবোধ উভয়েই বড় আনন্দিত হইল। কন্যাকে লইয়া লীলা কিছুদিন অন্য সকল ভাবনা ভুলিল। জননীহৃদয়ে অপত্যস্নেহ সাধারণতঃ বড় প্রবল। তাহাতে লীলার আবার তাহা অধিক হইবার কারণ ছিল। সন্তান লইয়া নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার সময় লীলা মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে, সে গত-জীবনের দুঃখের স্মৃতি বিস্মৃত হইবে। দুহিতার বদনে লীলা আপনার বদনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিত; দুহিতার কণ্ঠস্বরে সে প্রবোধের কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিত।

লতিকা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর নাড়িয়া, লতিকা যখন তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, তখন লীলার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। প্রবোধের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী বলিতেন, "আজকালকার মেয়েগুলা বড় বেহায়া হইয়া উঠিয়াছে। ছোট বৌয়ের এই প্রথম ছেলে; সকলের সামনে কি অমন করে, মেয়েকে আদর করে! সারাদিন কোলে মেয়ে! আমাদের কালে অমন বেহায়াপনা দেখ্‌লে শাশুড়ী বৌয়ের গায় হাতা পোড়াইয়া দিত।" প্রবোধের মাতা বলিতেন,

বিপত্নীক।

"তা, দিদি, এখন রকম হয়েছে ঐ, তার আর কি? আর দিদি, তাতে দোষই বা কি? ছেলেমানুষ,—প্রথম ছেলের উপর কিছু বেশী মায়া হ'তেই পারে।" দিদি বহুকাল হাস্যরসে বঞ্চিত, মুখখানা দ্বিগুণ পোড়াইয়া বলিতেন, "তোমার বৌ তোমার ভাল লাগিলেই ভাল। আমার আর কি? তা আমি ত ওদের বলি, আমি এখন সংসারের কেহ নই,—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে। তাই বা দেয় না কেন?" প্রবোধের জননী আর কিছু বলিতেন না। লতিকা বাপ, মা, জ্যেঠা, জ্যেঠাই, ঠাকুরমা, সকলের আদুরে হইয়া উঠিল। লীলার দুহিতা আদরের উপযুক্তই বটে; কাঁচা সোনার মত রং, রাঙ্গা রাঙ্গা কোমল ওষ্ঠাধর, মিশমিশে কালো কোঁকড়া চুল, মোটা সোটা গঠন; লতিকাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

যে দিন শরৎ প্রভাকে কবিতা শুনাইয়াছিল, তাহার কয় দিন পরে অপরাহ্নে কলিকাতায় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। প্রথম ফাল্গুন; আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই দেখিয়া প্রবোধ একটু বেড়াইতে গিয়াছিল। এক এক দিন সখ করিয়া প্রবোধ হাঁটিয়া বহু দূর বেড়াইয়া আসিত। আজ প্রবোধ অধিক দূর যাইতে না যাইতেই আকাশে খানকতক মেঘ একত্র হইয়া রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মহানগরীর উপর জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রবোধ আর যাইতে পারিল না। রাস্তায় গাড়ী না পাইয়া প্রবোধ ভিজিতে ভিজিতে ফিরিয়া

আসিল। সে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন লতিকা প্রাঙ্গনের অপর পার্শ্বে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বৃষ্টি দেখিতেছিল। সে আধ স্বরে বলিতেছিল,—

"কাক দেব মুড়ে
আয় বৃষ্টি ঝুড়ে।"

প্রবোধকে দেখিয়া লতিকা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"নেবুর পাতা, করমচা
যা বৃষ্টি ধরে' যা।"

বোধ হয়, তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বৃষ্টিকর্ত্তা, সেই বালিকাসুলভ কোমল কণ্ঠ হইতে এই অনুরোধটুকু শুনিবার জন্যই এ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত নিবারণ করেন নাই। তাহার পর সে ছুটিয়া প্রাঙ্গন পার হইতে গেল। জলপাত হেতু সিমেণ্ট-করা উঠানে পিছল ছিল; পা পিছলাইয়া লতিকা কঠিন শানের উপর পড়িয়া গেল।

প্রবোধ ছুটিয়া গেল। মস্তকে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া লতিকা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টিবারি, যেন ম্লান কুসুম ভাবিয়া, তাহার মুখ ধৌত করিতেছিল। মুদিতকমল-কোরকতুল্য বালিকাকে কোলে তুলিয়া প্রবোধ ঘরে গেল। মুখে, চক্ষে জল দিতে দিতে ও বাতাস করিতে করিতে লতিকার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ততক্ষণ প্রবোধ দুহিতার মস্তক

ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর দিবস প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রবোধ বক্ষে বেদনা অনুভব করিল—ভাবিল, সামান্য সর্দ্দি।

সে দিন প্রবোধের এক ভাগিনেয়ীর বিবাহ। সমস্ত দিন প্রবোধ ভগিনীর গৃহে গুরুশ্রম করিল; শীকরশীতল সমীরণ সে দিন প্রবোধের পক্ষে বিষতুল্য কার্য্য করিল; কারণ, সেদিন বড় বৃষ্টি হইল, মেদুর অম্বরে মেঘমালা অনবরত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন গুরুশ্রমের পর প্রবোধ রাত্রে কয় ঘণ্টা ঘুমাইল; আবার উঠিয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাহার পর দিবস বর-বিদায়ের পর প্রবোধ গৃহে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে শয্যার আশ্রয় লইল; বড় পিপাসা অনুভব করিল। কয় বার জল দিয়া লীলা একবার তাহার গাত্রে হাত দিয়া দেখিল, গা আগুনের মত তপ্ত। লীলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রবোধ বলিল, শ্রম হেতু; কিন্তু আজ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার বুকে ব্যথা অনুভূত হইতেছিল।

আরও একদিন গেল; তাহার পরদিন প্রবোধ আর শয্যাত্যাগ করিল না। ডাক্তার আনান হইল। ডাক্তার বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন; তাঁহার মুখে কোনও ভাবব্যঞ্জক চিহ্নমাত্র নাই। ডাক্তার যখন রোগীকে পরীক্ষা করেন, তখন তাঁহার মুখ যেন প্রস্তরে খোদিত বোধ হয়;—তাহাতে কোনও ভাবই লক্ষিত হয় না; তাহা হইতে কিছুই বুঝিবার যো নাই।

বিপত্নীক।

ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইতিমধ্যে কোনও দিন বড় ভিজিয়াছিলেন?"

প্রবোধ উত্তর দিল, "হাঁ।"

"সিক্তবস্ত্র সত্বর ত্যাগ করেন নাই?"

"সিক্তবস্ত্র গায় শুকাইয়াছিল; তখন সে কথা ভাবিতে পারি নাই।"

"তাহার পর দিবস অসুখ বোধ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, বুকে ব্যথা বোধ হইয়াছিল।"

"জ্বরভাব?"

"হাঁ।"

"প্রথমেই চিকিৎসা করান নাই কেন?"

"বড় ব্যস্ত ছিলাম, আর ভাবিয়াছিলাম, সামান্য সর্দি,—আপনিই সারিয়া যাইবে।"

"বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন।"

রোগীকে তিরস্কার করা চিকিৎসকের একটা রোগ।

তাহার পর চিকিৎসক আর একবার রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাপ লইলেন; ঘড়ী খুলিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে রোগীর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাহিরের ঘরে টেবিলের কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া, ওষ্ঠাধর-মধ্যে কলমের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া,

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ডাক্তার কয়েক মিনিট ভাবিলেন; তাহার পর ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অধিক কালি তুলিয়া এবং দোয়াতের পার্শ্বে কলম ঝাড়িয়া, খস্ খস্ করিয়া ক'খানা প্রেস্ক্রিপ্সন লিখিয়া ফেলিলেন। কোন্ খানার ঔষধের কি করিতে হইবে, প্রবোধের জ্যেষ্ঠকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

প্রবোধের জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?"

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, "পীড়া কঠিন; বড় কাল-ক্ষয় হইয়াছে।"

"সারিতে কত দিন লাগিবে?"

"নিশ্চয় বলিতে পারি না।"

"আপনি রোগের অবস্থা কিরূপ বোধ করেন?"

"এরূপ রোগে পূর্ব্বে কিছু বলিবার উপায় নাই; কিছুদিন না দেখিলে বলা যায় না।"

ডাক্তার পকেট হইতে চুরুটের কেস বাহির করিয়া, একটা চুরুট লইলেন। দেশলাইয়ের বাক্সের অনুসন্ধানে পুনশ্চ পকেটে হাত দিলেন।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া প্রবোধের জ্যেষ্ঠ ভীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "নিউমোনিয়া?"

চুরুটটি ধরাইয়া ডাক্তার দুইবার টানিয়া একটু ধূমোদ্গীরণ

করিলেন। তাহার পর দেশলাইয়ের বাক্সটা পকেটে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে চুরুটটা ধরিয়া, চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ডবল্ নিউমোনিয়া।"

ভিজিটের টাকা কয়টি লইয়া ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেঘসমাগম।

কয় দিন বড় গরম পড়িয়াছে;—বাতাস যেন অগ্নিশিখা। দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত প্রকৃতি যেন তন্দ্রাকুল। তপনতাপতপ্ত রাজপথে জনস্রোতেও ভাঁটা পড়িয়াছে; লোকসংখ্যা নিতান্তই অল্প। মধ্যে মধ্যে দুই একটা শ্রান্ত অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গাড়ী টানিয়া ছুটিয়া যাইতেছে; আর মধ্যে মধ্যে বায়সকুল যেন মহোৎসব সূচনা করিয়া চীৎকার করিতেছে। শ্বেতাভনীল আকাশে রবিকর এতই তীব্র যে, চাহিতে কষ্ট বোধ হয়।

রবিবার-আফিস নাই; শীতলপাটি-পাতা বিছানায় শুইয়া যোগেশ বাবু আল্‌বোলায় ধূমপানরত। আবরণহীন হর্ম্ম্যতলে সুকুমারী বসিয়া আছেন; কোলে ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যোগেশ বাবুর বন্ধুগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, মা ষষ্ঠীর কৃপায়, তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড় কখনও শূন্য থাকিতে দেখা যায় না। স্বামী স্ত্রীতে প্রবোধের পীড়ার কথা হইতেছিল। সুকুমারী বলিলেন, "তা ডাক্তারকে বলিয়া আর কোন ডাক্তার আনাইলে হইত না?"

যোগেশ বাবু হাসিয়া আল্‌বোলার নলটা নামাইলেন, বলিলেন, "ডাক্তারকে বলিয়া কেন?"

বিপত্নীক।

"সে যদি বলে, সে রোগমুক্ত করিতে পারিবে না।"

"সে আপনি তা বলিবে বটে! দেখ, এক গ্রামে জমীদার-বাড়ীতে একবার বড় চুরি হইতে লাগিল। উপরি উপরি কয় বার চুরি হইয়া গেল। চোর ধরা পড়িল না। দোবে চোবের দল বড় বড় দাড়ীশুদ্ধ মুখ গম্ভীর করিয়া, ভোঁতা ভোঁতা তরবারে ধার দিতে দিতে, পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবুর ছেলে ঐ যে কি জল আনায়, আর খায়, ও মুসলমানের ছোঁয়া, ওতে নারায়ণচন্দ্র বড় নারাজ, ঐ জন্যই চুরি হয়েছে। মুসলমান পাইকেরা স্থির করিল যে এ আর কিছুই নহে—খোদ শয়তানের কাজ, নহিলে যেখানে পাখী উড়িয়া যাইতে পারে না, চোরের সাধ্য কি যে, সেখানে যায়? আস্তাবলের এক জন হিন্দুস্থানী ঘোড়ার সহিস এক দিন আছারী আসিয়া দেওয়ানের কাছে বলিল, 'দেওয়ানজি মোশা, হামাকে ছ'টা পয়সা দিন, হামি চোর ধর্‌বে।' দেওয়ান বলিলেন, 'চোর ধর্‌বি কেমন করে?' সে বলিল, 'হামি তীর ধনুক বানাবে; ঐ রাস্তা দিয়ে রাত্তিরে চোর গেলে তাকে বিঁধবে।' দেওয়ান বলিলেন, 'রাস্তায় কত লোক যায়, চোর বুঝ্‌বি কেমন করে?' সে অম্লানবদনে উত্তর করিল, 'তাকে জিজ্ঞাসা করবে,—তুমি চোর আছে, কি সাধ আছে; যদি সে বল্‌বে সাধ আছে, তবে তাকে ছেড়ে দেবে, যদি সে বল্‌বে সে চোর আছে, তাকে ওমনি বিঁধবে।' তোমার কথা

সেই রকম। ডাক্তার যদি বলে যে, সে রোগমুক্ত করিতে পারিবে না, তবে অন্য ডাক্তার আনিতে হইবে!" যোগেশ বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

সুকুমারী সত্য সত্যই বড় চিন্তিতা হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "আজ দুই জন বড় ইংরাজ ডাক্তার আসিয়াছিলেন।"

"তাঁহারা কি বলিলেন?"

"সেই এক কথা। এখনও কিছু বলিতে পারা যায় না।"

"লীলা কি বড় ভাব্‌ছে?"

"হাঁ, কয় দিনে বড় রোগা হইয়া গিয়াছে; দিন রাত প্রবোধের পাশে বসিয়া আছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।"

"লতিকা কেমন আছে?"

"সে এক একবার ছুটিয়া ছুটিয়া যায়; বাবাকে ডাকে, মাকে ডাকে, উত্তর না পাইয়া বারান্দায় আসে; ডাগর ডাগর চোখ জলে ভাসিয়া যায়। আজ কয় দিন সে তা'র জ্যাঠার কোলেই ফিরিতেছে।"

সুকুমারী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আজ লতিকাকে দেখিতে যাইব।"

যোগেশ বলিলেন "যাইও।"

বিপত্নীক।

সুকুমারী ছেলেকে শোয়াইতে উঠিয়া গেলেন। যোগেশ বাবু পার্শ্বস্থিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে সুকুমারী যখন প্রবোধদিগের গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় বসন্তকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসন্তকুমার বলিলেন, "দিদি, কোথায় যাইবে?"

সুকুমারী বলিলেন, "প্রবোধের অসুখ। দেখিতে যাইব।"

"আজ অসুখ কেমন?"

"আজ সকালে 'উনি' গিয়াছিলেন; বলিলেন, অসুখ সমান।"

"যোগেশ বাবু কোথায়?"

"ঐ ঘরে।"

"তিনি কি যাইবেন?"

"হাঁ।"

"চল, আমিও যাইব।"

তাহার পর তিন জন প্রবোধকে দেখিতে গেলেন।

সুকুমারী অন্তঃপুরে গমন করিলেন। যোগেশ বাবু ও বসন্তকুমারের আগমনসংবাদ পাইয়া, লতিকাকে কোলে করিয়া, প্রবোধের জ্যেষ্ঠ বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখ মলিন, উদ্বেগচিহ্নময়। যোগেশ বাবুকে দেখিয়া লতিকা হাসিয়া বলিল, "বাবা ঘুমিয়ে আছে।" সুবোধচন্দ্রের বদনে বড় যাতনার

ভাব লক্ষিত হইল ; তিনি ভাবিলেন, হায়! অবোধ বালিকা! তুমি কিছুই বুঝিতেছ না!

বসন্তকুমার বলিলেন, "সুবোধ দাদা, আজ প্রবোধ কেমন আছে ?"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "কিছুই উন্নতি বুঝি না ; ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।"

লতিকা সুবোধচন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "জ্যাঠামণি, চল আমাকে ফুল তুলে দেবে।" "মোহন ফুল তুলে দেবে" বলিয়া তিনি মোহন নামধারী এক জন ভৃত্যের কাছে তাহাকে দিলেন। সে তাহাকে বাগানে লইয়া গেল।

বসন্তকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারেরা কি বলেন ?"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "তাহারা বলেন, জীবনের আশা অল্প।" কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "ভাই, যাহা করিতে হয় তোমরা কর ; আমি আর পারি না, আমার মাথা স্থির নাই। আমার সর্ব্বস্ব যাইয়া কেন আমার ভাই বাঁচুক না!" সুবোধচন্দ্র আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন ; তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, "যখন পিতৃহীন হইয়া ছিলাম, তখন প্রবোধের বয়স পাঁচ বৎসর। সেই হইতে প্রবোধ কখনও আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই, আজ কি সে আমায় ছাড়িয়া যাইবে!" তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া আসিল।

তিন জনে বসিয়া রহিলেন। বাহিরে রাজপথে জনস্রোত বহিতে লাগিল; সৌধ-চূড়া হইতে ম্লানতেজা রবিকর নামিয়া যাইতে লাগিল; নীলাম্বরে অসম্পূর্ণ চন্দ্রের অদৃশ্য-প্রায়-মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময় একরাশি কুসুম লইয়া লতিকা ফিরিয়া আসিল; যেন কুসুমরাশির মধ্যে মধুরতম কুসুম—যেন যূথি, জাতি মল্লিকার মধ্যে বিকাশোন্মুখ নলিনী। লতিকা ছুটিয়া আসিয়া ফুলগুলা জ্যাঠা মহাশয়ের কোলের উপর ফেলিয়া বলিল, "দেখেছ কত ফুল?" সুবোধচন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

এক জন ডাক্তার আসিলে, সুবোধচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া প্রবোধের নিকট গমন করিলেন। বসন্তকুমার বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া বসন্তকুমার শরৎকে লিখিলেন যে, প্রবোধ ডবল নিউমোনিয়ায় পীড়িত,—তাহার বাঁচিবার বড় আশা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুত্ব।

সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল শৈলসঙ্কুল বন্ধুর ভূমির উপর পড়িয়াছে। রোগক্লিষ্ট-কামিনীগণ্ড-পাণ্ডু ম্লানচন্দ্র আকাশে কিরণ ছড়াইতেছে; চারি পার্শ্বে তারকা; নিম্নে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একখানা ঘনধূসরবর্ণ মেঘে ঘন ঘন বিজলি চমকাইতেছে; অদূরে শৈল-সমাচ্ছন্নকারী একটা শালবন হইতে এক প্রকার মৃদুগন্ধ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; পাদপাচ্ছন্ন শ্যাম শৈলমালা ম্লানচন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখাইতেছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটা অনিদ্র বিহগের স্বরও শ্রুত হইতেছে।

শরতের ত্রিতলস্থ বসিবার ঘরে হর্ম্ম্যতলে বড় বড় দুইটা ব্যাগ পড়িয়া আছে। দ্রব্যাদিতে সে দুইটার বৃহৎ বৃহৎ উদর পূর্ণ। মুক্ত বাতায়ন-পথে শরৎ আকাশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছে, প্রভা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। প্রভার মুখ বড় ভাবনা-গম্ভীর; প্রভা বলিল, "কত দিনে ফিরিবে?"

শরৎ বলিল, "কেমন করিয়া, বলিব, প্রভা? একটু না সারিলে ত ফেলিয়া আসিতে পারিব না।"

বিপত্নীক।

সারিবার কথাই সহজে মনে হয়। নিমজ্জনোন্মুখ ব্যক্তি শেষকালে জলোপরি প্লবমান তৃণখণ্ডেরও অবলম্বন লয়। আশাহীন হইয়া কেহ বাঁচিতে পারে কি?

প্রভা বলিল, "যদি তোমার অধিক বিলম্ব হয়?"

শরৎ বলিল, "যত শীঘ্র পারি, আসিব। তবে কয় দিন হইবে, ঠিক বলিতে পারি না।"

"লীলা বোধ হয় বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

"এখন হইয়া উঠিল না; তোমাকে ত কলিকাতায় লইয়া যাইবই; তখন দেখা করিও।"

প্রভার লোহিতাভ গণ্ডদ্বয় লজ্জায় লোহিত হইয়া উঠিল। শরৎ উঠিয়া পত্নীকে বাহুপাশবদ্ধ করিয়া তাহার মুখে গাঢ় চুম্বন দান করিল; প্রভা শরতের মুখ চুম্বন করিল।

শরৎ চলিয়া গেল। বিবাহের পর হইতে শরৎ আর কখনও প্রভার নিকট হইতে এত দূরে যায় নাই। প্রভার আয়ত নয়ন হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়া গণ্ডস্থলে কাঁপিল। প্রভা বড় কোমলা;—যেন সুচিক্কণ পল্লবের ছায়াস্নিগ্ধ আবরণান্তরালে প্রভাতের শিশিরসিক্ত যুথিকা, মন্দ বাতাসে কাঁপিয়া উঠে, রবিকরস্পর্শমাত্র ম্লান হইয়া যায়, ভাল করিয়া চাহিতেও সাহস করে না, আবার বাতাস একটু বেগে বহিলে ঝর ঝর করিয়া তাহার নয়ন-জল ঝরিয়া পড়ে।

প্রভা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল! আকাশে এক এক খানা করিয়া মেঘ সমাগত হইতে লাগিল, তাহার পর ঝড় উঠিল! প্রভা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এ দিকে বৃষ্টি আরব্ধ হইলে পিসীমার মনে পড়িল যে, উপরে প্রভা একা আছে। সন্তানসম্ভবা রমণীর ঝড়বৃষ্টিতে একাকিনী থাকা ভাল নহে, তাই হরিনামের মালা জপিতে জপিতে পিসীমা উপরে আসিলেন। সাধারণতঃ তিনি উপরে আসিতেন না; মাদুরমোড়া মেঝে সাত শত জন্মে ধৌত করা হয় না, সুতরাং তাঁহার সে দিকে আসিতে বড়ই আপত্তি ছিল। অবশ্য শরৎ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাই যে প্রধান কারণ, এমন কথা বলিতেন না, তাহাকে বলিতেন, "বুড়ো মানুষ আর বড় সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারি না।" সেও একটা কারণ বটে; কিন্তু সেটা মুখ্য নহে, গৌণ।

পিসীমা প্রভার শয়নকক্ষে প্রভাকে না পাইয়া, শরতের বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, প্রভা একখানা চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছে। পিসীমার ক্ষীণদৃষ্টি নয়নে ঠাহর হইল না যে, প্রভা কাঁদিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ সময় কি একা থাকিতে আছে, বৌমা? চল, নীচেয় আমার কাছে বসিবে; কত সেকালের গল্প বলিব।" প্রভা সেকালের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত।

প্রভা পিসীমার কক্ষে আসিল; পিসীমা সে কালের গল্প

করিতে লাগিলেন ;—শ্বাশুড়ী কেমন করিয়া বধূকে নির্য্যাতন করিত, ননন্দা কেমন করিয়া আপনি ক্ষীরসর খাইয়া ভ্রাতৃবধূ ঘুমাইলে তাহার ওষ্ঠাধরে একটু মাথাইয়া সেই পরের মেয়েকেই ষোলআনা অপরাধিনী প্রমাণ করিত, পিসীমা সেই সকল বলিতে লাগিলেন।

প্রভা সে সকল কথা শুনিতে লাগিল, কিন্তু সব বুঝিতে পারিল না। কারণ সে কেবল ভাবিতেছিল, এই সঙ্কটশঙ্কিল রজনীতে শরৎ এতক্ষণ কত দূর গেল !

রাত্রে বড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভা শরতের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

শরৎ প্রবোধকে দেখিতে কলিকাতায় গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যালোক।

প্রভাতে উঠিয়া প্রভা দেখিল, প্রকৃতির শোভা বড় মধুর। আকাশে মেঘ নাই ; সেই মেঘমুক্ত উদার গগনে তরুণতপন কিরণ জাগাইয়া তুলিতেছে, প্রকৃতি সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-স্নাতা ; বৃষ্টিবারিবিধৌত ঘনশ্যামবর্ণ তরুলতা প্রভাতপবন-প্রবাহে মৃদুমর্ম্মর রব তুলিতেছে ; গত রজনীর বৃষ্টিপাতে শৈল-অঙ্গে একাধিক সুপ্ত নির্ঝর জাগরিত হইয়াছে ; বিহগের প্রভাতী গীতের সহিত তাহাদিগের পবনবাহিত মৃদু ঝর্ঝর-শব্দ মিশাইয়া যাইতেছে। চারি পার্শ্বে বন্ধুর ভূমিতে তৃণশষ্য তপনতাপে ম্লানবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা আবার হরিৎ দেখাইতেছে ; দূরে ধৌতধূলি শালবনের ঘনবিন্যস্ত পত্ররাশি নীলাম্বরতলে হরিৎ চন্দ্রাতপের মত দেখাইতেছে ; মধুর পবন বহিতেছে।

প্রভা একবার মুগ্ধনয়নে চারি দিকে চাহিল ; কিন্তু আজ এ সকল তাহার ভাল লাগিল না।

প্রভা আপনার বসিবার ঘরে গেল ; চারি পার্শ্বে প্রাচীরে শিশুদিগের সুন্দর ছবি বিলম্বিত।

বিপত্নীক।

শরৎ তাহার সব ঘরে এই সব সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। প্রভা একবার ছবিগুলা দেখিল, ভাল লাগিল না। তাহার পর ছাদে যাইয়া প্রভা টবের গাছে ফুটন্ত ফুলগুলা দেখিল, ভাল লাগিল না। তাহার পর ঝি বাগান হইতে কতকগুলা ফুল লইয়া আসিল। প্রভা ফুলদানিতে ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে গেল। ফুলগুলা সাজান হইলে আবার বড় শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল; যেন কিছুই কাজ নাই; আবার কোন কাজই ভাল লাগে না।

তাহার পর প্রভা একখানা পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিল; কিছুক্ষণ পরেই সেখানি ফেলিয়া উঠিয়া পিসীমার কাছে গেল। এতক্ষণে শরতের টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিল। প্রভা একটু স্থির হইল। মধ্যাহ্নে প্রভা শরৎকে পত্র লিখিতে বসিল। সে ইতঃপূর্ব্বে কখনও স্বামীকে পত্র লিখে নাই, বড় বাধ বাধ বোধ হইতে লাগিল। আর—কি লিখিবে? প্রথমে ভাবিল, শরৎকে শীঘ্র শীঘ্র আসিতে লিখিবে; তা'র পরেই ভাবিল, যদি শরৎ ভাবে, সে বড় স্বার্থপর—ছিঃ, তাহা হইলে সে বড় লজ্জা! লিখিবে, "তুমি কবে আসিবে?" তাহা হইলেই শরৎ বুঝিতে পারিবে। তখন প্রভা কাগজ বাহির করিয়া বসিল। কিন্তু আবার,—কি পাঠ লিখিবে? অনেক ভাবিয়া শেষে প্রভা লিখিল,—

"প্রিয়তম,

"তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

"প্রবোধ বাবু কেমন আছেন, জানিতে বড় উৎসুক রহিয়াছি। তাঁহার কথা আমায় লিখিও। লীলা কেমন আছেন?

"তুমি চলিয়া গেলে, এখানে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল। পথে তোমার কোনও কষ্ট হয় নাই ত?

"তুমি সাবধানে থাকিও। তুমি কবে আসিবে? আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মা, বড়ঠাকুর, দিদি, ছেলে মেয়েরা, আশা করি, ভালই আছেন। দিদি বহুদিন আমায় পত্র লেখেন নাই কেন?

"প্রবোধ বাবুর সংবাদ যত সত্বর পার, লিখিও।

"আমরা ভাল আছি।

"তোমার প্রভা।'

বহুক্ষণ ভাবিয়া প্রভা পত্রখানা লিখিল। প্রভা ভাবিয়াছিল, নানা কথা লিখিবে, চার পৃষ্ঠা ভরিয়া লিখিবে; কিন্তু লিখিবার সময় কিছুতেই কথা যোগাইল না। লিখিবার আর কিছু না পাইয়া প্রভা পত্রখানা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

প্রভা পত্রের যে উত্তর পাইল, তাহা বড় সংক্ষিপ্ত। পেন্সিলে তাড়াতাড়ি লেখা,—

বিপত্নীক।

"প্রভা,

"তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

"প্রবোধ একটুও সারে নাই। কি হইবে, জানি না।

"আমি ভাল আছি। আমার পত্র পাও বা না পাও, প্রত্যহ আমাকে পত্র লিখিতে ভুলিও না। আমাকে সর্ব্বদাই রোগীর কাছে থাকিতে হয়। বড় ব্যস্ত। আজ ইতি।

"তোমার শরৎ।"

শরৎ পত্রে তারিখ দিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। পোষ্ট আফিসের মোহরের তারিখ দেখিয়া প্রভা তারিখ বুঝিল। প্রভা বড় চিন্তিতা হইল। পত্রের উত্তর লিখিয়া প্রভা যাহা করিতে গেল, কিছুই ভাল লাগিল না। প্রভা পিত্রালয়ে পত্র লিখিতে বসিল, ভাল লাগিল না;—পুস্তক পাঠ করিতে গেল, ভাল লাগিল না;—একটা ফুল লইয়া তাহার দলগুলা ছিঁড়িতে লাগিল, তাহাও ভাল লাগিল না। প্রভা বসিয়া কেবল শরতের কথাই ভাবিতে লাগিল; তাহার পক্ষে জগৎ শরৎময়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

শরৎ প্রবোধকে দেখিতে গেল। রোগক্লিষ্ট প্রবোধ শয্যায় শয়ান; আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া চিন্তাক্লিষ্টা, উৎকণ্ঠামলিনাননা লীলা। পূর্ণিমা রজনীতে আকাশে সজলজলদজাল যেমন দেখায়, লীলার বিকশিতসরসিজললিত মুখে চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ছায়া তেমনই দেখাইতেছে। তাহার রজনীজাগরণজনিত অলস নয়নের পার্শ্বে কালিমা। তাহার বিশুষ্কবদনে ভীতিভাব।

দেখিয়া শরৎ ব্যথিত হইল। শরৎকে দেখিয়া অন্ধকারে ম্লানদীপালোকের মত প্রবোধের ক্ষীণ ওষ্ঠাধরে মৃদুহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই ম্লানহাসি দেখিয়া শরৎ বড় দুঃখিত হইল। শরৎ অতীতের কথা ভাবিল—সেই আশৈশব বন্ধুত্ব, সেই অকৃত্রিম প্রণয়! বড় কষ্টে শরৎ চক্ষের জল সংবরণ করিল।

চিকিৎসকের নিকট রোগীর অবস্থার কথা জানিয়া শরৎ সে দিন গৃহে ফিরিল। তাহার পরদিবস নানা পরীক্ষার পর ডাক্তারেরা বলিলেন যে, রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ

বোধ হইতেছে। সুবোধচন্দ্রের ভীতির আর অবধি রহিল না। শরৎ তাঁহাকে বলিল যে, গৃহের সকলেই রোগীর শয্যা-পার্শ্বে রাত্রিজাগরণ ও মানসিক উদ্বেগ হেতু শ্রান্ত, সে রোগীর শুশ্রূষায় তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে চাহে। তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, বিশেষতঃ শরৎ কেবল প্রবোধকে দেখিবার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছে। শরৎ প্রবোধের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল। শরৎ শ্রমসহিষ্ণু—সে অসীম আগ্রহে প্রবোধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

লীলা সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রায় স্বামীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিত না। শরৎ যখনই চাহিত, তখনই দেখিত, লীলা একদৃষ্টে প্রবোধের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছে! গভীর নিশীথে স্তিমিত প্রদীপে শরৎ দেখিতে পাইত, লীলার নয়নে অশ্রু; সজলনলিনীদলে রবিকরের মত তাহার অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীপালোক পড়িয়াছে। দিন দিন লীলা ছায়ার মত হইতেছিল। যখনই লীলা স্বামীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিত, তখনই সে বিরলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিত। রোগীর নিকট সে অশ্রু সংবরণ করিতে চেষ্টা করিত।

এই সময় শরতের এক দিনের ডায়েরী এইরূপ,—

"রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে—আমি এইবার শয়ন করিতে চলিলাম। প্রবোধের অবস্থা, উত্তরোত্তর মন্দ বোধ হইতেছে;

ডাক্তারেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছেন। আমি দিবাভাগে গৃহের অন্যান্য সকলের সহিত রোগীর শুশ্রূষা করি; রাত্রিকালে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত আমি আর লীলা সেই মন্দীভূতজীবনস্রোত রোগীর শয্যাপার্শ্বে উদ্বেগময় হৃদয় লইয়া বসিয়া থাকি। এখন হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সুবোধ বাবু ও তাঁহার পত্নী শুশ্রূষার ভার লইয়াছেন। উপর্য্যুপরি রাত্রি-জাগরণ হেতু তাঁহারা উভয়েই শ্রান্ত, তবুও তাঁহারা আমাকে আর জাগিতে দিবেন না।

"লীলার দুঃখের অবধি নাই। পূর্ব্বে সে কখন প্রবোধের কাছে কাঁদিত না; কিন্তু আজ দুই দিন সে প্রবোধের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াও অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। অভাগিনী হয় ত ভাবিতেছে, তাহার জীবনে মধ্যাহ্নেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সে ছায়ার মত মলিনা ও শীর্ণা হইয়া গিয়াছে।

"লতিকা কিছুই বুঝে না; আমাদের কোলে কোলে ফিরে, ফুল লইয়া খেলা করে, হাসে। কি হইবে, কে জানে? আজ আর পারি না।"

শরৎ যাইয়া শয়ন করিল; কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না। সে দূর অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। আশৈশব প্রবোধের সহিত গাঢ়তম বন্ধুত্বের কথা তাহার মনে পড়িল—তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে সহসা যেন অতীতের অন্ধকার-যবনিকা অপসৃত হইয়া গেল। যখন প্রবোধ ও

সে ছোট ছোট পুস্তক লইয়া স্কুলে পড়িতে যাইত, আর অবসরকালে আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা বলিয়া পরস্পরের সহিষ্ণু শ্রবণ পরিপ্লুত করিত, তখন হইতে প্রবোধের বিবাহ পর্য্যন্ত, তাহার পশ্চিমগমন পর্য্যন্ত, কত কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল! শরৎ অস্থির হইয়া উঠিল। সেই নদীতীরে দুজনের সাক্ষাৎ, প্রবোধের বিবাহ, আর তাহার সেই সন্দেহ! অবশ্য লীলা এখন সব ভুলিয়াছে, কিন্তু হতভাগিনীর দশা কি হইবে? ঐ কোমলা যুবতী সংসারের প্রবেশদ্বারেই কি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইবে? এত অল্প বয়সে, এত সুখ—এত আনন্দের মধ্যে সত্যই কি সে বিধবা হইবে? বিধবা হইবে! তাহার অপেক্ষা যাতনা আর কি আছে?

তাহার পর শরতের চিন্তাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। শরৎ ভাবিতে লাগিল, এই জগৎ যদি কোন করুণাময় সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তার নিয়মে চালিত, তবে এইরূপ অপ্রত্যাশিত-শোক মানবকে ব্যথিত করে কেন? সামান্য কণ্টকপীড়নে মানব ব্যথিত হয়, সন্তানের শোকে মানব অধীর হয়; আর যিনি বিশ্বপিতা, তিনি নিত্য শত সহস্র পুত্র-কন্যাকে সংহার করিতে বিচলিত হয়েন না! আবার পাপী পাপ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়—পুণ্যাত্মা দুঃখে কষ্টে হাহাকার করেন। কত সাধু ব্যক্তি প্রবঞ্চকের

প্রতারণায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেন; আবার কত প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনালব্ধ অর্থে জগতে যশের বাজারে যশঃক্রয় করে। কত জীব ত সৃষ্ট হইয়া কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের চিহ্নমাত্রও নাই; সে সকল জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? তবে কেমন করিয়া বলিব—সৃষ্টিস্থিতিলয়তত্ত্বের মূলে দয়া, করুণা, মমতা, আছে?

শরৎ ভাবিতে লাগিল, এই যে প্রবোধ আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এই কি উহার মরিবার বয়স? পথিপার্শ্বে কত অন্ধ, খঞ্জ জীবনে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছে, তাহারা রৌদ্রের সময় ছায়া পায় না, বৃষ্টির সময় আশ্রয় পায় না, ক্ষুধার সময় আহারও পায় না, তাহারা মৃত্যু কামনা করিতেছে; তাহারা কষ্ট পায়—মরে না; আর প্রবোধের মত যুবক শত আশা ও আনন্দের মধ্যে বাত্যাহত বৃক্ষের মত সহসা অপ্রত্যাশিত সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়! ঐ লীলা হতভাগিনীর এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা কি কোন করুণাময় ঈশ্বর সহ্য করিতে পারেন? আর ঐ লতিকা, ঐ যে কুসুমকোরক, জগতের কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, উহারই বা এ দুর্ভাগ্য কেন?

তাহার পর শরৎ ভাবিল, দূর হউক ছাই, বিশ্বনিয়ন্তার অসীম রহস্যে প্রবেশ করি, আমি ক্ষীণবুদ্ধি দীনশক্তি মানব, আমার এমন সাধ্য কি?

শরৎ মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিল, আকাশে একটা

বিপত্নীক।

অত্যুজ্জ্বল তারকা তাহার নীল গগনাসন হইতে চিন্তাত্রাড়িত শরৎকে লক্ষ্য করিতেছিল। তখন নিশা বিগতপ্রায়; শীতল বাতাসে সহজেই শরতের নিদ্রাকর্ষণ হইল। শরৎ ঘুমাইল। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শরৎ জাগিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত। তখন সেই তারকা তাহার ম্লান জ্যোতিঃ লইয়া উদয়োন্মুখ তপনের তীব্রকরসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে; দুই একটি ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গম প্রভাতের উদয় সূচনা করিয়া গান গাহিতেছে; নিশাশেষে শীতল পবন মৃদু মৃদু বহিয়া শরতের স্বেদসিক্ত ললাট স্পর্শ করিতেছে। গৃহের সকলে তখনও নিদ্রাগত, কেবল প্রবোধের কক্ষে শুশ্রূষাকারীরা জাগিয়া আছেন।

শরৎ শয্যা ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঝড় উঠিল।

প্রবোধের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। প্রতিদিন চিকিৎসকের দল আইসেন, নানারূপ পরীক্ষা করেন, বাহিরে বড় শ্বেত পাথরের টেব্‌ল ঘিরিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে পরামর্শ করেন, তাহার পর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিয়া প্রাপ্য টাকা কয়টি বুঝিয়া লইয়া প্রস্থান করেন। একজন পল্লীগ্রামবাসী একবার বলিয়াছিলেন যে, পীড়া হইলে জীবনের যে টুকু যম রাখিয়া যায়, ডাক্তারের পরীক্ষায় সে টুকুও যায়। নানা চিকিৎসক আইসেন, রোগীকে পরীক্ষা করেন, আর ভিজিটের টাকাটি পকেটস্থ করিয়া আলস্যমন্থরগমনে চুরুট টানিতে টানিতে নিশ্চিন্তভাবে গাড়ীতে উঠেন। আর পাড়ার লোকে বলাবলি করে, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইবে। আবার, যে ডাক্তারের মূর্খতা যত অধিক, পরামর্শকালে তিনি তত অধিক পরিমাণে ঔষধপ্রয়োগের প্রস্তাব করেন, কারণ নির্গুণ আদার তিন গুণ ঝাল।

কিন্তু ঔষধ সেবন করিবে কে? রোগীর আর সে সামর্থ্যও নাই। লীলা ও শরৎ আর রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে চাহে না। সেই মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহাদের কেশে কেশে

সংস্পর্শ হইল, উভয়ে ললাটে উভয়ের তপ্তনিশ্বাসস্পর্শানুভব করিল, উভয়েই রাত্রিদিন রোগীর সেবা করিতে লাগিল। লীলা দিন দিন এমন হইতে লাগিল যে, তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কে তাহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে; তাহার সুন্দর আননে অস্থি লক্ষিত হইতেছে, তাহার বুদ্ধিব্যঞ্জক আয়ত লোচনযুগল কোটরগত, তাহার শীর্ণবদনে সুগঠিত নাসিকা অপরিমিত দীর্ঘ দেখাইতেছে, তাহার রক্তাভ গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ, তাহার দীর্ঘ নিবিড়কুন্তলজাল তৈল বিনা রূক্ষ, তাহার হস্তের অঙ্গুলিগুলি বড় লম্বা দেখাইতেছে। লীলার আর সে লাবণ্য নাই। উৎকণ্ঠায়, শ্রমে, অসাধারণ-রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতী শ্রীহীনা হইয়াছে।

কিন্তু এত শুশ্রূষা, এত যত্ন—কিছুতেই কিছু হইল না। লীলা দেখিতে লাগিল, তাহার স্বামীর জীবনস্রোতঃ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। লীলা বুঝিল, তাহার সর্ব্বনাশের অধিক বিলম্ব নাই। রমণীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা যাতনার বিষয় আর কি আছে?

সুবোধচন্দ্র অধীর হইয়া পড়িলেন। কেবল এই দুঃখের সময়, তিনি যখনই প্রবোধের নিকট না থাকিতেন, তখনই লতিকাকে কোলে রাখিতেন! এই যাতনার মধ্যে প্রবোধের দুহিতাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা।

যেদিন প্রবোধের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল, সে দিন

তাহার স্নেহময়ী জননী ত বিষাদে শয্যাশায়িনী হইলেন। গৃহে একটা বিষাদের ঘন ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কেহই সশব্দে দ্বার মুক্ত বা রুদ্ধ করে না, সকলে ধীরপদক্ষেপে যাতায়াত করে, চপল বালকবালিকারাও সে স্তব্ধতা ভগ্ন করিতে সাহস করে না—তাহারাও মৃদুস্বরে পরস্পরের সহিত কথা কহে। সে গৃহে যেন সকলেই ভীত—নানা দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কক্ষের কোণে কোণে কাগজ, বস্ত্রখণ্ড ও ধূলি জমা হইয়াছে, কেহ পরিষ্কারও করে নাই। সেই সকল ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারাও ভীত হইয়া পড়িয়াছে। গৃহে মৃত্যু লুকাইয়া আছে, তাই সকলেই যেন ভীত।

এমনই ভাবে দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িল। উদ্বেগাকুল পরিবারবর্গ রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন। প্রভাতের সূর্য্য মধ্যগগনে উঠিল—মধ্যগগন হইতে তপন পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িল, দূর প্রান্তরের পরপারে তপন আপনার সমাধিশয়নে প্রবেশ করিল—রোগীর জীবনদীপ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—তারকাশোভাময়ী সন্ধ্যা রাত্রিতে নিমগ্ন হইয়া গেল, রোগীর ক্ষীণজ্যোতিঃ জীবনদীপ ম্লানতর হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে রজনী প্রভাত হইল, দিবালোকের আগমনে অন্ধকার পলায়ন

করিল, গৃহে গৃহে দীপ নির্ব্বাপিত হইল। রোগীর জীবন-দীপও নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। লীনার সর্ব্বনাশ হইল।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া শরৎ দেখিল, বন্ধুর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শরতের সেদিনের ডায়েরী এইরূপ,—

" 'যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য; কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে।'

"আমার আশৈশব বন্ধু আজ-মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত।

"মানবজীবন কুসুমতুল্য; তাহা প্রভাতে ফুটে, আর দিন যাইতে না যাইতেই শুকাইয়া যায়।

"অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত আশা, তাহারই মধ্য হইতে প্রবোধ জগদতীত কোথাও গিয়াছে।

"প্রেমময়ী পত্নী, প্রাণের কন্যা, স্নেহময় পরিজনবর্গ, সকলকে কাঁদাইয়া প্রবোধ জগৎ ত্যাগ করিয়াছে। এ মৃত্যু অপ্রত্যাশিত।

"যাও প্রবোধ, তোমার মত পুণ্যাত্মা অনন্ত আলোক-রাজ্যে, অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবে।"

ডায়েরীর সেই পৃষ্ঠায় কয় ফোঁটা অশ্রুচিহ্ন বিদ্যমান; তাহাতে কয় স্থানে লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে লেখা দেখিলে, বোধ হয়, যেন লিখিবার সময় লেখকের অঙ্গুলি কম্পিত হইয়াছিল।

বিপত্নীক।

সেই দিন ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী শরতের মনে আবার সেই প্রশ্ন উঠিল—এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা যদি করুণাময়, তবে এ অপ্রত্যাশিত শোক কেন?

শরৎ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের আলোক।

প্রবোধের মৃত্যুর পর শরৎ দুই দিন কলিকাতায় রহিল, তাহার পর পশ্চিম চলিয়া গেল। বসন্তকুমার ও তাঁহার জননী শরৎকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন সে প্রভাকে লইয়া সত্বর কলিকাতায় চলিয়া আইসে। শরতের ওকালতি করা নিতান্তই আবশ্যক ছিল না; যে কারণে সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আর কেহই জানিত না। সুতরাং তাহার পক্ষে ওকালতি ছাড়িয়া আসা কিছুই কষ্টকর হইবে না; শরৎ সম্মত হইল। পশ্চিমে কলিকাতার মত ভাল চিকিৎসকাদি পাওয়া দুর্ঘট, সেই জন্য শরৎ পূর্ব্বেই প্রভাকে কলিকাতায় আনিবার কথা ভাবিয়াছিল।

যেদিন প্রভাতে শরৎ তাহার বাসায় উপস্থিত হইল, সেদিন সকাল হইতেই প্রভা বড় অধীর হইয়া উঠিল। কুসুম-কোমল করে প্রভা শরতের কক্ষে কক্ষে কুসুমরাশি সাজাইয়া কেবল পথপানে চাহিতেছে, তাহার বোধ হইতেছে, যেন আজ আর গাড়ী আইসে না! সে ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতেছে, ঘড়ী কি বন্ধ হইয়া গিয়াছে নাকি? না তাহাও ত নহে; তবে! প্রভা আর একটি ঘড়ী দেখিল; সব ঘড়ীগুলা পরামর্শ করিয়া

কম চলিতেছে। প্রভা আপনার ভ্রমে আপনি লজ্জিতা হইল; কিন্তু আবার ঘড়ীর দিকে চাহিল। এমন সময় শরৎ আসিল।

প্রভা দেখিল, শরৎ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে। শরৎকে কষ্ট দিবার ভয়ে প্রভা সাহস করিয়া তাহাকে প্রবোধের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। শরৎ তাহা বুঝিয়া সে কথা আদ্যন্ত বিবৃত করিল। প্রভার আয়ত লোচনে জল টল টল করিতে লাগিল। তাহার পর প্রভা লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিল। শরৎ বলিল যে, প্রবোধের মৃত্যুর দিন লীলাকে দেখিয়া চিকিৎসকগণ ভীত হইয়াছিলেন; তাহার ভাবহীনদৃষ্টি, শীর্ণ দেহ, রুক্ষ কেশজাল দেখিয়া সকলে ভাবিলেন, অভাগিনী বুঝি উন্মাদিনী হইবে। লীলার নয়নে অশ্রুও নাই;—সে পাগলের মত প্রবোধের মৃতমুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবোধের দেহ সংকারার্থ লইয়া গেলে, লীলা ছিন্নমূলতরুর ন্যায় হর্ম্ম্য-তলে পড়িল। সকলে তাহাকে তুলিয়া বসাইল; লীলা কিছুই বলিল না, লীলা কাঁদিলও না। তখন একজন বৃদ্ধ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে সুবোধ বাবুর পত্নী লতিকাকে তাহার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। এইবার লীলার রুদ্ধ অশ্রুর উৎস মুক্ত হইল; লতিকাকে কোলে লইয়া লীলা কাঁদিতে লাগিল; মেয়েও কাঁদিতে লাগিল।

শরতের নয়ন জলে ভরিয়া আসিল। প্রভা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিশ্রামলাভান্তর প্রভার সহিত নানা কথা কহিতে শরতের দিন কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে শরৎ প্রভাকে বলিল যে, সকলে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রভা এখন বড় আনন্দিতা; সন্তানলাভাশায় কোন্ রমণী না আনন্দিতা হয়েন? আমার সন্তান—এই চিন্তাতেই রমণীর প্রভূত আনন্দ! স্বামীর ক্রোড়ে সন্তান দিতে পারিলে, রমণী যে আনন্দ লাভ করেন, আর কিছুতেই তিনি সে আনন্দ লাভ করেন না। সেই সন্তানলাভাশায় প্রভা এখন বড় আনন্দিতা।

সন্ধ্যাকালে কয় জন মক্কেলের সহিত কথাবার্তা কহিয়া আসিয়া শরৎ ত্রিতলস্থ মুক্ত ছাদে বসিল। তাহার পর ঘর হইতে একটা ছোট হারমোনিয়ম আনিয়া প্রভাকে বাজাইতে বলিল। প্রভা বাজাইতে লাগিল, আর শরৎ অলসভাবে এক খানা চেয়ারে বসিয়া শুনিতে লাগিল। শরৎ দেখিতে লাগিল, প্রভার কোমল অঙ্গুলিচয় যন্ত্রের চাবিগুলির উপর ছুটাছুটি করিতেছে; মধ্যে মধ্যে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত অলঙ্কারে মৃদু মৃদু শব্দ উঠিতেছে, প্রভা স্থিরদৃষ্টিতে যন্ত্রের দিকে চাহিয়া আছে। প্রভা একে একে শরতের প্রিয় সুর কয়টি বাজাইল, তাহার পর আসিয়া শরতের পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিল। সন্ধ্যার শান্তির ছায়া যেন উভয়ের হৃদয়ে পড়িয়াছিল; আকাশে একে একে তারাগুলি ফুটিতে লাগিল; দুই জনে দেখিতে লাগিল।

যেন একই হিল্লোলে উভয়ের হৃদয় হিল্লোলিত হইতেছিল—কেহ কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে আকাশে চন্দ্র উঠিল, প্রকৃতির মুখ হইতে অন্ধকারাবগুণ্ঠন অপসৃত হইল।

তাহার পর যেন দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত হইবার জন্য শরৎ যন্ত্রের কাছে গেল। তাহার বাদ্যকুশল অঙ্গুলিস্পর্শে যন্ত্র হইতে অতি মধুর স্বর উঠিতে লাগিল। তাহার পর শরৎ একটা বিষাদভরা গান গাহিল। সেই বিষাদের সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল, হারমোনিয়ম যন্ত্রের উদারা-মুদারা-তারা হইতে যেন কাতর ক্রন্দনের করুণ সুর উঠিতে লাগিল—সেই সান্ধ্যছায়াস্নিগ্ধ আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। যেন দূরে তারা হইতে তারায় সেই স্বর একটা অস্ফুট মর্ম্মান্তিক বেদনা উত্থিত করিতে লাগিল। কড়ি ও কোমল যেন কাতরতার স্বর তুলিতে লাগিল, আর শরতের মধুর কণ্ঠস্বর বিষাদময় সুরে সেই শান্ত সন্ধ্যা প্লাবিত করিতে লাগিল।

সে দিন প্রভা বহুবার লীলার কথা ভাবিয়াছিল—রাত্রিকালে সে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। শরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল, শরৎ প্রভাকে জাগাইয়া তাহার সহিত নানাবিধ কথা কহিতে লাগিল। সন্তানসম্ভবা রমণীর পক্ষে সহসা ভয় পাওয়া ভাল নহে, তাই শরৎ স্বপ্নের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া নানা গল্প করিল। তাহার পর প্রভা ঘুমাইল।

বিপত্নীক।

তাহার পর হইতে শরৎ কলিকাতায় গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় প্রেরিত হইতে লাগিল। শরৎ কয় মাসের জন্য গমনের সকল স্থির করিল।

জলের স্রোতের মত দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শরতের কলিকাতায় গমনের দিন আসিল। প্রভাকে লইয়া শরৎ কলিকাতায় গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্নেহ।

প্রভার পিতামাতা প্রভার পিত্রালয়ে অবস্থিতির প্রস্তাব করিলেন। শরৎ কিংবা প্রভা কাহারও তাহা ইচ্ছা নহে। শরৎ ভাবিল, এ সময় সে প্রভার কাছে থাকিলেই ভাল হয়; আর সেই জন্যই সে পশ্চিম হইতে প্রভার সহিত আসিয়াছিল। প্রভা বুঝিল, শরৎকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে—সে থাকিতে চাহিল না। পিতামাতা ভাবিলেন, বিবাহ দিলে মেয়ে পর হইয়া যায়। পিতা কন্যার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন; প্রভা তাহাতে দুঃখিতা হইল।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম প্রভার বড় অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। তাহার সেই শৈলসঙ্কুল প্রদেশের গৃহের অবাধমুক্ত স্বাধীনতায়, আর তাহার কলিকাতার গৃহের শত নিয়মবন্ধনে, অনেক প্রভেদ। বনবিহারিণী হরিণীকে তাহার কাননবাস হইতে গৃহে আনিলে সে যেমন বোধ করে, প্রভাও প্রথম প্রথম কতকটা সেইরূপ বোধ করিল। সেখানে কিছু বলিবার কেহ ছিল না, এখানে কথায় কথায় লোকনিন্দার নিষ্ঠুর দংশন। ছাদে উঠিতে লোকনিন্দা, শকটদ্বার মুক্ত করিয়া যাইতে লোকনিন্দা, কথায় কথায় লোকনিন্দা।

বিপত্নীক।

সেখানে উদারপ্রকৃতির অনন্তশোভা, এখানে জগৎ যেন ইট কাঠে গড়া; সেখানে যেন দুইটি মানবের জন্য অনন্ত প্রকৃতি, এখানে যেন পিঞ্জরে দুইটি বিহগ। প্রভাতে সন্ধ্যায় কুসুমকাননে বিচরণ, কুসুম লইয়া খেলা, দুই জনে প্রকৃতির শোভাসন্দর্শন; সেখানে যেমন মনের আনন্দ, এখানে তাহার শতাংশের একাংশও আছে কি? পুরুষ লোকনিন্দাকে ভয় না করিতে পারে, কিন্তু রমণী তাহা পারে কি? গণনাতীত কাল হইতে যে পরনির্ভরতা, যে ভীতি, রমণীর প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, তাহা কি এক দিনে যাইতে পারে? বিশেষ প্রভার মত কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না রমণী যে, সামান্য যন্ত্রণা সহিতে পারে না, সামান্য আঘাতে ব্যথিত হয়, সে কি এত সহ্য করিতে পারে? যে দেশের পুরুষ রমণীকে অজ্ঞানতা ও অধীনতার অন্ধতিমিরতলে রাখিয়া গর্ব্বানুভব করে, যে দেশের পুরুষ রমণীকে সম্মান করিতে জানে না, যে দেশের পুরুষ রমণীর দিকে চাহিতেও জানে না, যে দেশের নব্য লোকাচারে —যে পাপে রমণীর মৃত্যু অপেক্ষাও কঠোর দণ্ড, সেই পাপে পুরুষের অসম্মান পর্য্যন্ত নাই—সে দেশে রমণীর সুখের আশা কোথায়?

তদ্ভিন্ন প্রভার আর এক অসুবিধা ছিল। সে দেখিল, এখানে সকলেই তাহার সুখবিধানে চেষ্টিত। বসন্তকুমারের সৌভ্রাত্র অতুলনীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শরৎ

জননীর বড় স্নেহাস্পদ—তাহাতে সে এখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে গৃহাগত। ভ্রাতা ভ্রাতাকে স্নেহ করিলে তাহার পত্নীকেও সমধিক স্নেহ করেন; যে পুত্র জননীর অধিক প্রিয়, সেই পুত্রের পত্নীও পুত্রবধূদিগের মধ্যে তাঁহার অধিক প্রিয় হয়েন। বিশেষ প্রভার প্রিয় না হইবার কোনও কারণ ছিল না—যে অপরের সুখের জন্য প্রাণপাত করিতে পারে, যে সকলকে আপনার ভাবে, তাহার প্রিয় না হইবার কোনই কারণ নাই; তাই প্রভা বসন্তকুমারের পত্নীরও অপ্রিয় নহে।

শরৎ ও প্রভাকে পাইয়া বসন্তকুমারের পুত্রকন্যাদিগের আর আনন্দ ধরে না—যেন তাহারা দুই জন সমবয়স্ক খেলার সাথী পাইয়াছে। তাহারা পরস্পরের মধ্যে আপোষ করিয়া স্থির করিয়া লইল, কে কাকার স্কন্ধ, কে কাকার ক্রোড় ও কে কাকার হস্তদ্বয় অধিকার করিবে। বড়টি গর্ব্বসহকারে বিদ্যালয়ে তাহার সহপাঠীদিগকে জানাইল যে, তাহার কাকা আসাতে সমস্ত বিশ্বের নিয়মবহির্ভূত একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। সে ঘটনাটা যেন জগতের সকলেরই জানা একান্ত আবশ্যক। তাহার পর সে আরও গর্ব্বের সহিত বলিল যে, তাহার কাকা কুড়িটা আলমারী-ভরা পুস্তক আনিয়াছেন; আর কাহারও কাকার যে সত্যসত্যই কুড়িটা আলমারী-ভরা পুস্তক থাকিতে পারে, এটা তাহার বিশ্বাসের মধ্যেই আসিল না। বড় মেয়েটি প্রতিবেশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমবয়স্কা

কন্যাকে আনিয়া তাহার কাকা ও কাকীমাকে দেখাইয়া তবে ছাড়িল। তাহার কাকা ও কাকীমার আগমনের মত বিস্ময়কর ব্যাপার সকলকে না জানাইলে কি চলে? শরৎকে সারাদিন তাহাদের সহিত খেলা করিতে হইত। তাহারা কাকার পুস্তকগুলা উল্টাপাল্টা করিত, ফুলদানী হইতে ফুল চাহিয়া লইত, কাগজ আনিয়া নৌকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়া চৌবাচ্চার জলে ভাসাইত, আর নৌকা ভাসিলে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের করতালিধ্বনিতে সৌধোপরি উপবিষ্ট বায়স-কুল চমকিয়া উঠিত।

বসন্তকুমার তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে, তাহারা কাকার কাছে নালিশ করিত; আর মা কিছু বলিলে, তাহারা কাকী-মার কাছে নালিশ করিত। বসন্তকুমার ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগের বিচারের বিরুদ্ধে এই আপিলে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতেন।

এখন অবসর পাইয়া শরৎ বাঙ্গালা লেখায় মনোযোগ দিল। শরতের প্রভূত ক্ষমতা ছিল, আর সে ক্ষমতার অপব্যয় হয় নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার যশোলাভ নিশ্চিত।

এইরূপে আনন্দ ও আশার মধ্যে শরৎ ও প্রভার দিন কাটিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

কলিকাতায় আসিয়া শরৎ একদিনও লতিকাকে দেখিতে যায় নাই। প্রবোধের মৃত্যুর পর আর সে গৃহে যাইতে শরতের ইচ্ছা ছিল না। তবে শরৎ সর্ব্বদাই লীলা ও লতিকার সংবাদ লইত। সুবোধ বাবুর সহিত একদিন তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে যাইবার অনুরোধ করিতে সাহস করেন নাই।

এই সময় এক দিন অপ্রত্যাশিতভাবে শরতের সহিত লতিকার দেখা হইল।

এক দিন অপরাহ্ণে শরৎ গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিল; তখন মেঘের উপর অস্তগমনোন্মুখ রবির কিরণ পড়িয়াছে; তীরতরুরাজির শ্যামশিরঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; নদীবক্ষে তরঙ্গ উঠিতেছে—আর সেই তরঙ্গিততরঙ্গিণীহৃদয়ে আকাশের প্রতিবিম্ব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে; গঙ্গাবক্ষে তরণীশ্রেণী বদ্ধ—দুই এক খানা পোত যাত্রার পাথেয়ের জন্য প্রভূত বাষ্প সঞ্চয় করিতেছে, তাই ধীরে ধীরে ধূমোদ্গিরণ করিতেছে, চিমনী হইতে ধূমরাশি উঠিয়া পবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে; পথে শকট সকল পবনস্পর্শলোলুপ নরনারীদিগকে বহন করিয়া

ছুটিতেছে—আরোহীরা অনতিনিম্নস্বরে পরস্পরের সহিত কত কথা কহিতেছে ও হাসিতেছে।

এই স্থানে আসিয়া শরতের আর এক এমনই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। যে দিন সন্ধ্যাকালে এই জাহ্নবীতীরে প্রবোধ ও সে প্রবোধের বিবাহের কথা কহিয়াছিল, সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িল। তখন তাহারা উভয়েই অবিবাহিত - তাহার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, আজ কোথায় প্রবোধ! ভাবিতে ভাবিতে শরৎ বহু দূর আসিয়াছিল; সে দিন যেখানে উভয়ে বসিয়াছিল, সে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ দেখিল, সেখানে নদীতীরে শ্যামতৃণভূমি তেমনই রহিয়াছে, পার্শ্বে একটা অনতি উচ্চ বৃক্ষের পত্ররাজির উপর তেমনই ধূলি পড়িয়াছে, নদীর তরঙ্গমালা অসরল তটের উপর তেমনই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; পরপারে তীরতরুলতা তেমনই দেখাইতেছে। সেই চলোর্শ্মিতাড়িত নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া শরৎ দেখিল, প্রকৃতির যেন কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সবই সেইরূপ রহিয়াছে, নদী তেমনই বহিতেছে, পবন তেমনই তাহার স্বেদলাঞ্ছিত ললাট স্পর্শ করিতেছে, সকলই সেইরূপ রহিয়াছে। শরতের হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রশ্ন উঠিল—প্রবোধ কোথায়?

শরতের বোধ হইল, যেন পবনতাড়িত পাদপপত্রের মৃদু মর্ম্মরশব্দে সেই একই গভীর বেদনাব্যঞ্জক প্রশ্ন উঠিতেছে—

প্রবোধ কোথায়? যেন তটিনীতরঙ্গমালার কলকল ধ্বনিতে সেই একই কাতর প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রবোধ কোথায়? শরতের বোধ হইল, যেন তাহার চারি দিক হইতে একটা গভীর বেদনার আর্ত্তনাদ, হাহাকার উঠিতেছে, যেন সান্ধ্য পবন একটা বেদনার বার্ত্তামাত্র বহিতেছে, যেন নদীর কলকলে একটা অস্ফুট কাতরতামাত্র ব্যক্ত হইতেছে। যেন সান্ধ্যগগন একটা কাতরতার করুণক্রন্দনে আপ্লুত!

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে পরিচিত মধুরকণ্ঠে আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল, "কাকা! কাকা!" সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই চিন্তাতাড়িত হইয়া শরৎ ফিরিয়া দেখিল, সেই প্রবোধের পিতৃহীনা কন্যা তাহাকে দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে তাহাকে ডাকিতেছে। সে তাহার দুইখানি কোমলবাহু বাড়াইয়া দিয়াছে—কোলে কর। শরৎ আর চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাহার পদতলে তৃণশয়নে পড়িল।

শরৎকে দেখিয়া সুবোধ বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন ও লতিকাকে নামাইলেন। লতিকা ছুটিয়া আসিয়া শরতের হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। শরৎ তাহাকে কোলে করিল না দেখিয়া, উচ্ছ্বসিত অভিমানে অভিমানিনী বালিকা তাহার কাছ হইতে সরিয়া বিস্ময়, নৈরাশ্য ও ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। শরৎ আর থাকিতে পারিল

না। তাহাকে বক্ষে তুলিয়া তাহার অভিমানস্ফুরিতাধরে ও বদনে চুম্বনের পর চুম্বন দান করিল।

শরৎ কাঁদিতেছে দেখিয়া লতিকা বলিল, "কাকা, তোমরা সবাই কাঁদ কেন?" তাহার পর উত্তরের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে বলিল, "কাকা, বাবা কোথায়?" শরৎ তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না—সুবোধচন্দ্রের নয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া আসিল।

সেই সময় একটা পাখী আসিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষের শাখায় বসিল; লতিকা তাহা দেখিতে পাইয়া সুবোধচন্দ্রকে বলিল, "পাখী ধরে—।" সুবোধ বাবু হাত বাড়াইলে পাখী উড়িয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত একটা সামান্য পাখী ধরিতে পারিলেন না দেখিয়া লতিকার বড় হাসি পাইল—তাঁহার পক্ষে একটা পাখী ধরিতে না পারা যে নিতান্ত লজ্জার বিষয়, লতিকার তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। "ধত্তে পাল্লে না" বলিয়া সে খুব হাসিয়া উঠিল; তাহার কলহাস্য সেই শান্ত সান্ধ্যগগনে কোনও আকাশসম্ভব মধুর হাস্য বলিয়া বোধ হইল।

সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, সুবোধ বাবু ঠাণ্ডা লাগিলে লতিকার অসুখ হইবার আশঙ্কায়, প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলেন। লতিকা শরৎকে বলিল, "কাকা কাল আমাদের বাড়ী যাবে?" শরৎ উত্তর দিল না; কিন্তু লতিকা বলিল যে, কাকা কাল যাইতে স্বীকার না করিলে সে কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে

না। সে শরতের গলা জড়াইয়া ধরিল—অগত্যা শরৎ যাইতে স্বীকৃত হইল। সুবোধ বাবু তাহাকে তাহার গৃহে নামাইয়া দিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, শরৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইল।

সুবোধ বাবু চলিয়া গেলেন—তাঁহার শকটের আলোক দূরে খদ্যোতের মত প্রতীয়মান হইল, তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন শরৎ শ্রান্তভাবে সেই তৃণাবৃত ভূমির উপর উপবেশন করিল; বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া শরৎ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। কতক্ষণ কাঁদিল, শরৎ তাহা জানিতে পারিল না। উঠিয়া দেখিল, রাত্রি হইয়াছে; পথিপার্শ্বস্থ একটা আলোকের কিরণ বৃক্ষপত্রদলমধ্য হইতে সূত্রবৎ হইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে তৃণোপরি একখণ্ড ক্ষুদ্র হীরকের মত জ্বলিতেছে; পরিত্যক্ত পথে আলোকশ্রেণী মিট্‌মিট্ করিতেছে; পথে বড় লোক নাই, সহর কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ; নক্ষত্রচ্ছায়াদীপ্ত গঙ্গা-বারিরাশিতে কলকল এবং তরণীগুণ-শ্রেণীতে প্রতিহতবেগ পবনের সন্‌সন্ স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে; তরণীশ্রেণীর অঙ্গে নদীর তরঙ্গমালা চলাৎ চলাৎ শব্দ তুলিতেছে; মধ্যে মধ্যে দুই একখানা শকটের আলো কোনও দূরপথে দৃষ্ট হইতেছে।

কিছু দূর যাইয়া শরৎ পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান একখানা শকট ভাড়া করিল। শকট-চালকের চাবুকের শিষ্টসম্ভাষণে প্রস্তরময় পথে শকট টানিয়া অশ্ব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

সহরের মধ্যে তখনও লোকজনের গতায়াত বন্ধ হয় নাই, তবে দিবসের সহিত তুলনায় এখন পথে জনসংখ্যা অনেক অল্প।

শরৎ গৃহে উপনীত হইল ; তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া প্রভা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শরৎ তাহাকে লতিকার সকল কথা বলিল—শুনিয়া প্রভা অশ্রুমোচন করিল।

শরতের মনে আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠিল, ঈশ্বর যদি দয়াময়, তবে জগতে অপ্রত্যাশিত শোক কেন? শরৎ বহুক্ষণ ভাবিল—শেষে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইল।

পরদিন বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া শরৎ দেখিল যে, যখন সে লতিকাকে বলিয়াছে যে, সে সেই দিন তাহাদের বাটীতে যাইবে, তখন তাহার সেখানে যাওয়াই উচিত। মানব জীবনের প্রথম দশ বৎসরে যত শিক্ষা করে, বোধ হয় জীবনের আর সমস্ত অবশিষ্ট কালে তত শিক্ষা করে ; সুতরাং শিশুর নিকট মিথ্যা কথা বলার কুফল অতি ভীষণ। প্রবোধের মৃত্যুর পর শরৎ আর সে গৃহে যায় নাই। আজ শরৎ ভাবিল যে, যখন সে লতিকাকে বলিয়াছে যে, সে যাইবে, তখন সেখানে যাইতে তাহার যতই কষ্ট হউক না কেন, সে যাইবেই। অপরাহ্নে শরৎ লতিকাকে দেখিতে চলিল। কিন্তু একটা অব্যক্ত যাতনায় তাহার বড় বেদনা বোধ হইতে লাগিল।

বিপত্নীক।

ক্রমে শরৎ গৃহদ্বারে উপনীত হইল; শরতের মনে বড় অবসন্নতা, দেহে বড় দুর্ব্বলতা বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া শরৎ বারান্দায় উঠিল। সম্মুখেই প্রবোধের বসিবার ঘর— শরৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ভ্রাতার মৃত্যুর পর সুবোধ বাবু আর সে ঘরে প্রবেশ করেন নাই, কাজেই ভৃত্যেরাও আর সে ঘর পরিষ্কার করিত না। শরৎ দেখিল, কক্ষ-প্রাচীরে সেই বাইশখানা ছবি বিলম্বিত, এখন ফ্রেমে ঝুল বাধিয়াছে; আলমারীতে প্রবোধের চক্‌চকে বাঁধান বহিগুলি শোভা পাইতেছে; আলমারীর উপর ঘরের কোণে ঊর্ণনাভের জাল বিস্তৃত; ঘরের এক কোণে প্রবোধের বিজ্ঞান-পাঠ-সহচর যন্ত্রগুলি পড়িয়া আছে; তাহাদের উপর ধূলি জমিয়াছে—এখন আর কেহ রুমাল দিয়া তাহাদের গাত্রের ধূলি ঝাড়ে না; ব্রাকেটের উপর ঘড়িটা বন্ধ হইয়া আছে; আলনায় খান দুই কাপড় ঝুলিতেছে; এক কোণে প্রবোধের এক জোড়া জুতা রহিয়াছে; যে আলোটা সে ঘরে জ্বলিত, তাহার উপর এক খানা চাদর উড়িয়া পড়িয়াছে; টেব্‌লের উপর অনেকটা পুরু হইয়া ধূলি জমিয়াছে; দোয়াত-দানীর দোয়াতে কালি শুকাইয়া গিয়াছে; ব্লটিংপ্যাডের ব্লটিং কাগজের এক কোণ বাতাসে স্থানচ্যুত হইয়াছে; একটা কলম, কলমদানীতে আর একটা টেব্‌লের উপর পড়িয়া আছে; এক পার্শ্বে কয়খানা কাগজের উপর নানাপুষ্পচিত্রিত

বিপত্নীক।

একটা কাগজচাপা চাপা দেওয়া রহিয়াছে; একখানা অভিধান ও একখানা স্কটের কবিতা পড়িয়া আছে।

এ সকলই পরিচিত। শরতের মনে পড়িল, এই পরিচিত কক্ষে দুই বন্ধুতে কত সুখসন্ধ্যা কাটাইয়াছে, কত রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্ন যাপন করিয়াছে, কত পুস্তক পাঠ করিয়া এ উহাকে শুনাইয়াছে, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছে! সেই অতীতস্মৃতিসঙ্কুল কক্ষে আসিয়া শরৎ আর দাঁড়াইতে পারিল না—একখানা চেয়ারে বসিয়া ধূলিধূসর টেব্‌লের উপর স্থাপিত যুক্তবাহুযুগলোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া শরৎ কাঁদিতে লাগিল।

ভৃত্যের নিকট শরতের আগমনবার্ত্তা পাইয়া সুবোধচন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শরৎকে যেরূপে কাঁদিতে দেখিলেন, তাহাতে আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। ভ্রাতার মৃত্যুর পর প্রথম ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনিও দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহে ফিরিল। সে দিন সে আর লতিকাকে দেখিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ তবে সত্য!

সেই দিন রাত্রিকালে প্রভা লক্ষ্য করিল, শরৎ বড় বিষণ্ণ। প্রভা প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিল, পাছে কোন দুঃখের কথা মনে করাইয়া দিলে শরৎ বিষাদিত হয়। তবে প্রভা বুঝিল যে, লতিকাকে দেখিতে যাইয়া শরতের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "লতিকা ভাল আছে ত?" তখন শরৎ তাহাকে বলিল যে, প্রবোধের বসিবার ঘরে যাইয়া তাহার এমন বোধ হইয়াছিল যে, সে কেবল সেখানে বসিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, লতিকাকে দেখিয়া আসিতে পারে নাই।

শরৎ বড় সামান্য সামান্য কথাও মনে করিত। সে ভাবিল, লতিকাকে বলিয়া তাহাকে না দেখিয়া আসা তাহার উচিত হয় নাই। পরদিবস শরৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল যে, সে লতিকাকে দেখিতে যাইবে। কিছু করিবে, স্থির করিলে শরৎ তাহা করিয়া ছাড়িত।

সে দিন অপরাহ্নে শরৎ আবার মৃতবন্ধুর গৃহে গমন করিল। আজ বহু চেষ্টায় সে অশ্রু সংবরণ করিল। শরৎ প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া বারান্দায় উঠিল, কিন্তু আজ আর

প্রবোধের বসিবার ঘরে প্রবেশ না করিয়া বারান্দার অপর প্রান্তে সুবোধ বাবুর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে বসিয়া শরৎ এক জন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, সুবোধ বাবু কোথায়? সে বলিল, বড় বাবুর একটু অসুখ হওয়ায় তিনি দ্বিতলে শয়নকক্ষে আছেন। তখন শরৎ লতিকাকে আনিতে বলিল। শরৎ আসিয়াছে শুনিয়া লতিকা ছুটিয়া আসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি কাল আস নি?"

শরৎ বলিল, "এসেছিলাম—তোমায় ডাকি নি।"

"কেন ডাক নি? তুমি দুষ্টু।"

"তুমি লক্ষ্মী।"

"তুমি দুষ্টু। আমায় কোলে কর্‌লে না।"

শরৎ অন্যমনস্ক হইতেছিল—সে লতিকাকে কোলে লয় নাই। এখন লতিকাকে কোলে লইয়া সে বলিল, "আমি দুষ্টু কি না!"

"দুষ্টু ছেলেকে মার্‌তে হয়।"

"কে মারে?"

"কেন, মা মারে।"

"তুমি ত আমার মা।"

"তবে তুমি দুষ্টুমি কর্‌লে আমি মার্‌বো।"

মাতা পুত্রে এইরূপ আলাপ হইতেছিল, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, সুবোধ বাবু শরৎকে ডাকিতেছেন। লতিকাকে লইয়া শরৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিল। সুবোধ বাবুর কক্ষে মুক্তবাতায়নপথে শরৎ দেখিল, উদ্যানমধ্যস্থ সরসীর স্বচ্ছসলিলে তরঙ্গে তরঙ্গে রবিকর জলিতেছে; মুকুলাকুল কুসুমকুঞ্জে দুই একটা বিহগ গান গাহিতেছে, পবনে পুষ্পভারাবনতা লতা দুলিতেছে, প্রস্ফুটিত কুসুমের কাছে ভ্রমরকুল উড়িতেছে। সকলই সেইরূপ রহিয়াছে।

সুবোধচন্দ্রের ফুলদানি হইতে গোটাকতক ফুল লইয়া লতিকা ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শরৎকে ছুড়িয়া মারিল। সুবোধ বাবু বলিলেন, "ওকি, লতি?" লতিকা গম্ভীরভাবে বলিল "দুষ্টু ছেলে আমাকে কোলে করেনি, তাই মারছি।" শরৎ একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "মা কি কেবল মাত্র খাওয়ায়, থাবারও খাওয়ায়।" লতিকা ছেলের খাবারের আয়োজন করিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে লতিকা আসিয়া বলিল, "চল, জ্যেঠাইমা তোমাকে খাবার খেতে ডাকৃচেন।" সুবোধ বাবু বলিলেন, "যাও।" অগত্যা শরৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে গেল; এ গৃহে কি তাহার কিছু খাইতে ইচ্ছা করে! শরৎ দেখিল, কক্ষমধ্যে লীলা ও সুবোধ বাবুর পত্নী বসিয়া আছেন। আজ শরৎ চক্ষের জল ফেলিবে না, স্থির করিয়াছিল, বহু কষ্টে সে অশ্রু সংবরণ করিল। লীলা অসমগ্রভূষণা, কেবল হাতে কয় গাছি চুড়ি আছে—সুবোধ বাবুর পত্নী সে কয় গাছি খুলিতে দেন নাই। হায়! এই কি লীলার ব্রহ্মচর্য্যের বয়স।

সুবোধ বাবুর পত্নী শরৎকে গৃহের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; শরৎ সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিল। তাহার পর আর কোন কথা নাই—শরৎ দেখিল, তাহার কিছু বলা আবশ্যক। লীলার হাতে একখানা পুস্তক দেখিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি বহি?"

লীলা কিছু বলিল না, সুবোধ বাবুর পত্নী বলিলেন, "বিষবৃক্ষ।"

অন্য কথার অভাবে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা আপনার কেমন লাগে?" মুখচোরা শরৎ আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

তিনি বলিলেন, "বহিখানি ভাল, কিন্তু পোড়ারমুখী কুন্দের আবার বিবাহ কেন?"

"কেন?"

"হিন্দুর ঘরে কি বিধবার বিবাহ হয়?"

"আমরা হৃদয়হীন, তাই হয় না।"

"বিধবার আবার বিবাহ! সে যে মহাপাপ!"

শরতের একটা বিশেষত্ব ছিল—সে কোন বিষয়ে আপনার স্থিরীকৃত ধারণার সমর্থনার্থ অনেক কথা বলিত। যে বিষয়ে সে ভাবিয়া কোন মত স্থির করিয়াছে, সে বিষয়ে সে বিশেষ আগ্রহসহকারে স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিত। নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত উদার-সংস্কার-মতাবলম্বী শরৎ কতকটা বিদ্রোহি-

মতাবলম্বী। সে যাহা ভাল বুঝিত, তাহা সমর্থন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। শরৎ যুবক, দেশকালপাত্রের জন্ম মত গোপন করিত না। সে বলিল, "কিসে মহাপাপ? পুরুষ বিধিকর্ত্তা, তাই পুরুষের শত বিবাহেও পাপ নাই। এক সময় একাধিক বিবাহের কথা বলিতেছি না। কিন্তু বিপত্নীক যখন ইচ্ছা করিলে আবার বিবাহ করিতে পারে, তখন বিধবার পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ কেন? যে অধিকার পুরুষ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে অধিকারে রমণী বঞ্চিতা কেন? এ দেশে বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহ কেন, শৈশব-বিবাহও প্রচলিত; অনেক বালিকা নিতান্ত অল্পবয়সে বিধবা হয়—পতির কথা তাহাদের মনেও থাকে না। তাহাদের বিবাহ অন্যায় কিসে? যে বিধবা ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতে চাহে, তাহার বিবাহ হওয়া অবশ্যই উচিত।"

শরতের হুঁস ছিল না, কিন্তু বৌ-দিদির হুঁস ছিল যে, লীলা সেখানে আছে। তিনি ও কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। বকিতে বকিতে শরৎ খাবার শেষ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরপো, কিছু খাবার আনি, বস।" শরতের কিছু বলিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বুদ্ধি অধিক, পুরুষের এ গর্ব্বের কোন মূল নাই। যত সহজে পুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তত সহজে রমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে সংসার

চলিত না ; পুরুষ যত সহজে বিচলিত হয় রমণী তত সহজে বিচলিতা হইলে সংসারে সুখ থাকিত না। পুরুষ অস্থির—রমণী ধৈর্য্যশালিনী ; পুরুষ অসহিষ্ণু—রমণী সহিষ্ণু ; পুরুষ ঝঞ্ঝাবাত—রমণী মৃদুমলয়ানিল।

সহসা বাক্যস্রোতঃ রুদ্ধ হইলে শরৎ মুখ তুলিল। লীলা তাহার দিকে চাহিয়া আছে ! শরৎ দেখিল, লীলার পূর্ণোন্মুক্ত নয়ন জ্বলিতেছে। শরৎ তাহার দিকে চাহিল দেখিয়া লীলা দৃষ্টি নত করিয়া হর্ম্ম্যতলে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু তাহার গণ্ডে যে রক্তাভা ফুটিতেছিল, লীলা তাহা নিবারিত করিতে পারিল না। লীলার গণ্ডে গোলাপ ফুটিয়া মিশাইয়া গেল। তাহার পর নিম্নপানে চাহিয়া লীলা বলিল, "কেন আপনি আমার সমক্ষে বিধবাবিবাহের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে বসিলেন ?"

এই সময় খাবার লইয়া বৌ-দিদি ফিরিয়া আসিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া কতকগুলা সন্দেশ রসগোল্লা শরতের পাতে পড়িল। কিন্তু শরৎ আর খাইবে কি ? এতক্ষণ তাহার যে হুঁস ছিল না, এখন তাহার সে হুঁস হইয়াছে, শরৎ বোকা বনিয়া গেল। সহসা মেঘমধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত তাহার মনে স্মৃতি ফুটিয়া উঠিল ; তাহার মনে পড়িল, কেন সে সহসা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল, কেন সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল। মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের পরেই যেমন অন্ধকার আরও গাঢ় বোধ হয়, এই সকল কথা মনে পড়িবায়

পর শরতের মনে তেমনই অন্ধকার বোধ হইল। সহসা তাহার চক্ষের সম্মুখে সে কক্ষ যেন ঘুরিয়া গেল।

শরৎ তাড়াতাড়ি উঠিল—উঠিয়া সুবোধ বাবুর ঘরে গেল। সুবোধ বাবু তখন বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া উদ্যান-মধ্যে বালকবালিকাদিগের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। বালক-বালিকাদিগের আনন্দকোলাহলে সে উদ্যানভূমি তখন শব্দ-মুখরিত। শরতের সেসকলে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, সে সুবোধ বাবুর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। লতিকা তখন অন্যত্র ছিল, শরৎ যাইবার সময় তাহাকে দেখিয়া যাইতেও পারিল না। লতিকা যখন আসিয়া শুনিল যে, তাহার অবাধ্য পুত্র তাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন ছেলেকে ধরিয়া না রাখার জন্য সে জ্যেষ্ঠতাতের উপর বড় রাগ করিল; কিন্তু খেলার সাথীর উপর অধিকক্ষণ রাগ করিয়া থাকা যায় না—তাহার সকল কথা শুনিতে জ্যেষ্ঠতাতের মত সহিষ্ণু শ্রোতা আর নাই, তাহার সকল আবদার সহিতে তাঁহার মত আর কেহ নাই। কাজেই জ্যেষ্ঠতাতের উপর তাহার রাগ মিটিয়া গেল,—কেবল সে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, এবার ছেলে আসিলে তাহাকে খুব মারিবে।

এদিকে গৃহে ফিরিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া শরৎ খানিকটা ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া ডায়েরিতে লিখিল—

"আজ বড় অন্যায় করিয়াছি। লতিকাকে দেখিতে যাইয়া লীলার সম্মুখে যেরূপ ভাবে বিধবা-বিবাহের ন্যায়ান্যায়-সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি, সেরূপ করা বোধ হয় আমার উচিত হয় নাই। আমার পদে পদে এরূপ ভ্রম কেন? আমার ভাগ্যে কি শান্তিলাভ নাই?"

সেই দিন রাত্রে শনয়কক্ষে একখানা চেয়ারে বসিয়া শরৎ ভাবিতেছিল, এমন সময় প্রভা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার চক্ষু ঢাকিয়া ধরিল। কিন্তু শরতের মুখ বড় গম্ভীর দেখিয়া হাত সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ?" শরৎ বলিল, "ও কিছু নহে, চল শয়ন করি।"

প্রভার আয়তলোচনে জল আসিল। কেবল শরতের কাছে প্রভার কথা ফুটিত, সে বলিল,"এ পর্য্যন্ত দুই দিন তুমি আমার নিকট মনোভাব গোপন করিয়াছ। আরও একদিন তুমি এই-খানে বসিয়া এমনই করিয়া ভাবিতেছিলে,আর আমাকে বলিয়া-ছিলে, 'ও কিছু নয়।' কেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

স্বামীর মনোভাবগোপনের কথা কি স্ত্রী ভুলিয়া থাকে? স্বামীর অবহেলা কোনও স্ত্রী ভুলে না।

শরৎ বুঝিল, প্রভা কোন্ দিনের কথা বলিতেছে। সে বলিল, "সে সামান্য কথা।"

প্রভা বলিল, "আমার দুঃখ ক্ষুদ্র ভাবিতেছ; কিন্তু বালুকাও ক্ষুদ্র, হীরকও ক্ষুদ্র।"

শরৎ একবার ভাবিল, এ সময় প্রভাকে সে কথা বলা উচিত কি না? তাহার পর স্থির করিল, যাহা হইবার হউক; সে প্রভার নিকট কিছু গোপন করিবে না। প্রভার অশ্রু মুছাইয়া শরৎ তাহাকে শয্যার উপর বসাইয়া আপনি বসিল। তাহার পর প্রভার মাথা বুকের উপর রাখিয়া শরৎ বলিল, "প্রভা, সে দিনও যে কথা বলি নাই, আজও সেই কথা বলিতে চাহিতেছিলাম না।" তাহার পর শরৎ প্রভাকে একে একে সকল কথা বলিল। এত দিনে প্রভা বুঝিল, কেন শরৎ কলিকাতা হইতে গিয়াছিল।

সকল শুনিয়া প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে লীলা তোমায় ভালবাসে?"

পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া শরৎ বলিল, "আমার তাহাই সন্দেহ হইয়াছে।"

প্রভা বলিল, "আজ তাহার সাক্ষাতে ও সকল কথা বলিয়া ভাল কর নাই।"

শরৎ বলিল, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

মুখ নত করিয়া শরৎ প্রভার মুখচুম্বন করিল, প্রভা শরতের মুখচুম্বন করিল।

সে রাত্রে শরৎ বা প্রভা কাহারও ভাল নিদ্রা হইল না। উভয়েই লীলার কথা ভাবিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকালজলদ।

শরৎ দেখিল, সে প্রভাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল করে নাই। মনের যে আনন্দ তাহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, কলিকাতায় আসিয়া সে তাহা বড় পাইতেছে না। প্রভার পিতা বড় রাগী লোক; প্রভা যখন পিত্রালয়ে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তাঁহার বড় রাগ হইল। প্রভা তাঁহার বড় আদরের কন্যা; সেই প্রভা তাঁহাকে পর ভাবিল! তাঁহার বড় রাগ হইল। তিনি আর প্রভার কোন সংবাদ লইলেন না। প্রভা কয় দিন পিত্রালয়ে গিয়াছিল; তিনি তখন অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। একদিন কেবল প্রভা তাঁহার দেখা পাইয়াছিল; সে দিন তিনি কন্যার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তিনি কন্যার সংবাদ পর্য্যন্ত লইতে নিষেধ করিলেও, প্রভার মাতা গোপনে সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতেন, এবং তাহার অরুচি অবস্থায় মুখরোচক খাদ্যাদিও প্রেরণ করিতেন। সে জন্য মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিত; তবে কোনও কর্ত্তাই গৃহের গৃহিণীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না।

প্রভার পিতা বড় অবিবেচনার কার্য্য করিলেন। লোকের একটা স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য যে, তাহারা আপন আপন আদর্শে

অন্তের বিচার করে। বৃদ্ধ আপনার আদর্শে যুবকের বিচার করিয়া, সেই ভ্রম প্রযুক্ত যুবকের প্রতি অবিচার করেন; কারণ, তাঁহার ও যুবকের সুখ দুঃখ, আশা, আনন্দ, এক নহে; যৌবনের আবেগ, যৌবনের উৎসাহ, বার্দ্ধক্যে থাকে না; আবার বার্দ্ধক্যের সতর্কতা ও ভীতিভাব যৌবনে থাকে না। এইরূপে, যুবকও আবার আপনার আদর্শে বৃদ্ধের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করেন। প্রবীণা যখন বালিকাকে চাঞ্চল্যের জন্য তিরস্কার করিয়া তাহাকে স্থির গম্ভীর হইতে উপদেশ প্রদান করেন, বা নাসা সঙ্কুচিত করিয়া নবীনার কার্য্যপ্রণালীর উপর টীকা করেন, তখন তিনি আপনার আদর্শে বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রতি অবিচার করেন। আবার নবীনা যখন প্রবীণার কথা শুনিয়া ভাবেন, 'তোমার সে কাল আর নাই। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই,'—তখন তিনি আপনার আদর্শে বিচার করিয়া প্রবীণার প্রতি অবিচার করেন। শেষ কথা, পুরুষ আপনার আদর্শে রমণীর বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করেন; আর রমণী আপনার আদর্শে পুরুষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করেন। প্রভার পিতাও আপনার আদর্শে প্রভার বিচার করিয়া অন্যায় করিলেন। ইহাতে প্রভা মনে বড় কষ্ট পাইল; পিতার আদরের মেয়ে পিতার আদরে বঞ্চিতা হইয়া বড় কষ্ট অনুভব করিল।

বিপত্নীক।

তাহার পর তাহার দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা। শরৎ তাহাকে লীলার কথা বলিয়াছে। প্রভার একটা বিশ্বাস ছিল, সে শরতের উপযুক্ত নহে; বহুতর্ক সত্ত্বেও শরৎ তাহার মন হইতে সে বিশ্বাস দূর করিতে পারে নাই। এখন সহজেই প্রভা ভাবিল যে, তাহার অপেক্ষা লীলা হয় ত তাহার স্বামীকে অধিক সুখী করিতে পারিত। কিন্তু শরৎ আর কাহারও হইতে পারিত, এ চিন্তাতেও সে যাতনা অনুভব করিল। আর লীলার কথা ভাবিয়া সে দুঃখিতা হইল।

এ অবস্থায় সাধারণতঃ রমণীদিগের সুনিদ্রা হয় না তাহাতে আবার সারাদিন নানা চিন্তায় ব্যাপৃত থাকায় প্রভার অল্প নিদ্রাও দুঃস্বপ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। প্রভা বড় শীর্ণা হইতে লাগিল। এ সময় রমণীগণের দেহে দুর্ব্বলতা আইসে, প্রভার দুর্ব্বলতা আরও অধিক হইল।

শরৎ বড় চিন্তিত হইল। যতক্ষণ শরৎ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, ততক্ষণ প্রভা ভাল থাকিত। শরৎ আর বড় বাড়ীর বাহির হইত না; যতক্ষণ পারিত প্রভার কাছে থাকিত। তাহাতে প্রভা কিছু লজ্জিতা হইত। বিদেশে যেখানে সে গৃহকর্ত্রী ছিল, সেখানে আর এখানে অনেক প্রভেদ। একেই ত পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রভার "মেম" নাম রটিয়াছিল; এখন বিদ্রূপকুশলিনী, দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগপারদর্শিনী প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীগণ, তাহার কথা লইয়া বিদ্রূপ

করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভা বসন্তকুমারের পত্নীর অপ্রিয় ছিল না; বিশেষ তিনি পতি ও শ্বশ্রূর ভয়ে তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতেন না। এখন তিনিও গোপনে প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীদিগের কথায় যোগ দিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃই কিছু মুখরা ছিলেন; সেই মুখরাসুলভ অধিকবাক্য-প্রয়োগপ্রিয়তা-বশতঃই তিনি তাঁহাদিগের কথায় যোগ দিতেন। নহিলে গৃহে প্রভার অতিরিক্ত আদরে তাঁহার বিরক্ত হইবার কোনও কারণ ছিল না; কারণ তিনি জানিতেন, প্রভা বিদেশের পাখী, দুই দিন পরেই সে বিদেশে যাইবে, এখন যে কয় দিন সে আপনার গৃহে অতিথি, সে কয় দিন তাহাকে যত্ন করিলে বরং তাঁহার যশোলাভের সম্ভাবনা। কিন্তু পরচর্চ্চার সময় রসনার বেগসংবরণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। মহিলাগণের আলোচনার দুই একটা কথা প্রভার কানে আসিত, প্রভা কাঁদিত। শরৎ তাহাকে বুঝাইত যে, এ আলোচনায় তাহাদের উভয়ের কোনও ইষ্টানিষ্ট নাই; যে যাহা বলে বলুক, সে জন্য তাহার বিষণ্ণ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রভা তাহাই বুঝিত; কিন্তু আবার যখনই কোনও কথা শুনিত, তখনই কাঁদিত।

রমণীদিগের এই পরনিন্দাপ্রিয়তা, এই পরসুখাসহিষ্ণুতা এই পরশ্রীকাতরতা, এই সঙ্কীর্ণতা, এসকলের জন্য পুরুষ দায়ী। অন্তঃপুরিকার কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, তাঁহাদিগের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ,

কাজেই কোনও উদার চিন্তা, কোনও মহৎ ধারণা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। যদি সুশিক্ষায় তাঁহাদিগের মনের বিস্তার সাধিত হয়, তবে নিম্নভূমির জলস্রোতঃ যেমন গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সঙ্কীর্ণতা আর তাঁহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না। সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ বারি-রাশি যেমন রোগজনক হইয়া উঠে, তাহার বিমলতা ও স্নিগ্ধতা ও যেমন যাতনা ও মৃত্যুদায়ী হইয়া উঠে, তেমনই সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকায় রমণীদিগের হৃদয় সকল প্রকার উদারতা-বর্জ্জিত হইয়া কেবল অপকারের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণতা জননী হইতে পুত্রকন্যায় বর্ত্তাইতেছে; ইহাতে জাতীয় জীবনে মহা অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। রমণীগণকে এইরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখার কুফল সমস্ত সমাজকে ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে। জাতীয় জীবনে রমণীর সম্বন্ধ আমরা এখনও বুঝি নাই।

রমণী-রসনার তীব্র বিষের যন্ত্রণা প্রভা ভোগ করিল, এবং প্রভার সমবেদনায় শরৎও তাহা ভোগ করিল। প্রভা বিশীর্ণা হইতে লাগিল; তাহার সদাপ্রফুল্ল শিশিরবিধৌত-নলিনীবৎ বদনে বিষাদ ও চিন্তার ছায়া পড়িল। কেবল মধ্যে মধ্যে সুকুমারী আসিয়া, তাহার জীবনের এই একঘেয়ে কাতরতা দূর করিয়া, তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইতেন।

প্রভার অবস্থা দেখিয়া শরৎ অত্যন্ত আশঙ্কিত হইল।

তৃতীয় খণ্ড

অপরাহ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাতনা।

রমণীর পক্ষে যাহা অসাধারণ দুর্ভাগ্য, প্রভার তাহাই হইল,—অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রভা একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল। যে আশায় প্রভা এতদিন নানা দুঃখের মধ্যেও সকল সহ্য করিয়াছিল, তাহার সে আশাও সফল হইল না। এই সন্তানের উপর প্রভা কত আশাই স্থাপন করিয়াছিল! সন্তানের উপর সকল জননীই অসীম আশা স্থাপন করেন। আত্মজের প্রতি স্নেহ কাহার না হয়? কিন্তু সেই স্নেহের সহিত এত আশা না থাকিলে, জননী হাসিমুখে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। শরতের ক্রোড়ে সন্তান দিয়া আনন্দ লাভের আশা ভিন্ন, প্রভা আশা করিয়াছিল যে, তাহার সন্তান হইলে, তাহার স্নেহপরবশ পিতার এ রাগ আর থাকিবে না। প্রভার কল্পনাসৃষ্ট রম্য নন্দনকানন একদিনে মরুভূমি হইয়া গেল —তাহার সকল আশা বিনষ্ট হইল। প্রভা মনে মনে সন্তানের যে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার স্থানে যখন সে মৃত সন্তান দর্শন করিল, তখন সে মূর্চ্ছিতা হইল। সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া প্রসূতি সকল যাতনা বিস্মৃত হয়েন; আর মৃত সন্তানদর্শন করিলে বিষাদে, নৈরাশ্যে প্রসূতির হৃদয় ভাঙ্গিয়া

যায়। যেখানে আশা যত অধিক, সেখানে নৈরাশ্যও তত অধিক হইয়া থাকে। প্রথমে চিকিৎসকগণ ভীত হইলেন যে, প্রসূতি হয় ত বাঁচিবে না; তাহার পর তাঁহারা বলিলেন যে, প্রসূতির পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তবে আশু কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। শরৎ ভাবিল, "প্রভা প্রাণে বাঁচিলেই আমার যথেষ্ট।"

প্রভা তখন প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু তাহার প্রবল জ্বর হইল। জ্বরবিকারে প্রভার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল—প্রভা প্রলাপ বকিতে লাগিল; সেই প্রলাপে সে কেবল সন্তানের কথাই বলিতে লাগিল; আর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া শরৎ অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

শরতেরও দুঃখ অল্প হয় নাই, তাহারও বহু আশা নষ্ট হইয়াছিল—উদয়োন্মুখ তপন মেঘসমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। যাহাতে সন্তানের লালনপালন উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, শরৎ তাহার সকল উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদিনের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে যেমন উপবনের বিচিত্র কুসুম-শোভা বিনষ্ট হয়, তেমনই শরতের বহু আশা নষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর আবার প্রভার জন্য আশঙ্কা—সকল দুঃখ সহ্য করিয়া শরৎ প্রভার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল।

চিন্তাকুল হৃদয়ে শরৎ প্রভার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। গৃহ চিকিৎসকগণের হাট হইয়া উঠিল; দ্বারে

প্রবাহ দিয়া ডাক্তারদের গাড়ী দাঁড়াইল। ডক্তারগণ আইসেন, ঝগড়া দেখেন, সাবান দিয়া পরিষ্কার হাত আচার-রক্ষার্থ যোগেশ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, বাহিরে আসিয়া টেব্‌ল্ অসম্মত বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে পরামর্শ করেন, ব্যবস্থা দুই বে ও ভিজিটের টাকা লইয়া প্রস্থান করেন। সহিসেরা —র হইতে ব্যাগগুলা ঘরে রাখিয়া যায়, আবার ঘর হইতে গ ওতে লইয়া যায়, সেগুলা কোন ব্যবহারেই আইসে না; তবে সুখের বিষয়, কোন দিন ব্যাগ বদল হইয়া যায় নাই।

কন্যার পীড়ার কথা শুনিয়া প্রভার মাতা জিদ ধরিলেন যে, কন্যাকে দেখিতে যাইবেন। প্রভার পিতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন যে, তাহা কিছুতেই হইবে না। প্রভার মাতা কয় বার বলিলেন, কিন্তু কর্ত্তার সঙ্কল্প টলিল না। তখন একদিন কর্ত্তাকে না বলিয়া, মাতা কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। গৃহে ফিরিয়া গৃহিণী শয্যাশায়িনী হইলেন। কর্ত্তা যত জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হইয়াছে?' গৃহিণী ততই কাঁদেন। তাহার পর কর্ত্তা শুনিলেন, গৃহিণী কন্যাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছেন। তখন কর্ত্তা বুঝিলেন, কন্যার পীড়া গুরুতর হইয়াছে। বহুবার জিজ্ঞাসার পর গৃহিণী কর্ত্তাকে সকল কথা বলিলেন; তখন কর্ত্তার মনে হইল যে, কন্যাকে এত অযত্ন করিয়া ভাল করেন নাই। তখন তাঁহার একবার কন্যাকে

দেখিতে ইচ্ছা হইল। আবার ভাবিলেন, এখন এতদিন ও তত্ত কি বলিয়াই বা যাইবেন? এতদিন কন্যার কোন সন্ধান যে, লয়েন নাই, এখন সহসা কি বলিয়া তাহাকে দেখিতে যাইবেন? কিন্তু কোন কাজ করিতে যখন ইচ্ছা হয়, তখন তাহা করিবার ছুতার অভাব হয় না। কর্ত্তা মনকে বুঝাইলেন যে, মেয়ে যদি আপনার কর্ত্তব্য না করিয়া থাকে, তাই বলিয়া তিনি কেন আপনার কর্ত্তব্য করিবেন না? এত দিন পরে প্রভার পিতা প্রভাকে দেখিতে গেলেন। এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে পিতা ও সন্তানের মধ্যে মনোমালিন্য স্নেহে মগ্ন হইয়া যায়; আর ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শোণিত ও সলিল এক নহে।

কন্যাকে দেখিয়া আসিয়া পিতার হৃদয় দুঃখে দগ্ধ হইতে লাগিল। এতদিন কন্যাকে যে অযত্ন করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, সেইদিন হইতে প্রভার পিতা মাতা প্রতিদিন তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। প্রভার চেতনা নাই।

সুকুমারী প্রায় প্রতিদিনই প্রভাকে দেখিতে আসিতেন। তবে তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন সংসার ফেলিয়া আসার নানা অসুবিধা। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সংসারের সকল ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে; সংসারে স্ত্রীলোক আর কেহ নাই; এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। তিনি দেবরের

বিবাহ দিতে অবহেলা করার জন্য প্রতিদিন যোগেশ বাবুর সহিত ঝগড়া করেন, আর প্রতিদিনই ভুলিয়া যান যে, দোষ যোগেশ বাবুর নহে, তাঁহার দেবরই এখন বিবাহ করিতে অসম্মত। যে দিন সুকুমারী আসিতে না পারিতেন, সে দিন দুই বেলা খবর লইয়া গেলেও যোগেশ বাবুর নিস্তার ছিল না—রাত্রিকালে তাঁহাকে আরও একবার আসিতে হইত।

প্রভার চিকিৎসার বা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটি হইতেছিল না; কিন্তু জ্বর বড় ভীষণ হইয়াছিল, সহজে ছাড়িল না, সমান বহিতে লাগিল।

যাহাতে প্রভার শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়, বিরামবিহীন হইয়া শরৎ তাহা দেখিতে লাগিল। জ্বরের ঘোরে প্রভা যাহা যাহা বলিতে লাগিল, শরৎ সে সকল মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিল। এই বিপদের সময়ও বিদ্রূপকুশলিনী মহিলাগণ তাহার নিন্দা করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, শরৎ নিতান্তই মনুষ্যনামের অযোগ্য; স্বামী আবার কোন্ কালে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া চাকরের মত স্ত্রীর সেবা করে? উদাহরণেরও অভাব হইল না। কেহ বলিলেন, অমুক পীড়া হইলে একবার স্ত্রীকে দেখিতেও আইসে না; কেহ বলিলেন, অমুকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন একবার স্বামীকে দেখিতে চাহিয়াছিল, ঝি যাইয়া বলিল, "সেজ বাবু, বৌমা একবার মরণকালে আপনাকে দেখিতে

চাহিতেছেন।" সেজবাবু বলিল, "আমি আর যাইতে পারি না।" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তাই বলিয়া বাড়ীর সকলের সাক্ষাতে কি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে? কি ঘেন্না! আর শরৎ—জলজীয়ন্ত মা, দাদা সকলে রহিয়াছে, তবুও স্ত্রীর শুশ্রূষা করে! ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু শরৎ লোক নিন্দা অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছিল—চেষ্টা করিয়াই শিখিয়াছিল। কোনও কোনও বিষয়ে তাহার মত প্রচলিত লোকাচারের বিরুদ্ধ হইলে, শরং আপনার মতানুসারেই কার্য্য করিত, লোকাচারের জন্য বড় ভাবিত না। শরৎ ভাবিত যে, স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করা স্ত্রীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আবশ্যক হইলে স্ত্রীর শুশ্রূষা করাও স্বামীর সেইরূপ কর্ত্তব্য। সেইজন্য বিদ্রূপ সত্ত্বেও সে নিরস্ত হইল না।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; ডাক্তারেরা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, শুশ্রূষা চলিতে লাগিল; প্রভার জ্বরও সমান বহিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমারী।

শ্রাবণের আকাশে মেঘ ভরা; চারিদিকে কেবল বারিপাতের ঝরঝর শব্দ, আকাশে কেবল মেঘমালার শব্দহীন গমনাগমন। জলকণাভারকাতর পবন বহিয়া যাইতেছে; তীব্র আর্দ্রবায়ু ও বারিবিন্দুর গমন রোধ করিবার জন্য পথিপার্শ্বে প্রায় সকল গৃহেই বাতায়ন দ্বার রুদ্ধ। স্নিগ্ধ গম্ভীর অসীম অম্বরে আজ জলদগণ প্রাণ ভরিয়া আদিজননী সিন্ধুর ক্রোড়শায়িনী ধরণীর উপর বারিবর্ষণ করিতেছে। আজ এই আধ-আলো আধ-ছায়াময় দিবসে মেঘেরও বিশ্রাম নাই, পবনেরও বিশ্রাম নাই। কলিকাতার পথে কর্দ্দমের অভাব নাই; স্থানে স্থানে জলও বাধিয়াছে। কোথাও কোথাও দুই চারিটি বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছে; আর কেহ কেহ বা ছত্রাবৃত পথিকের গাত্রে জল দিবার অভিপ্রায়ে, পথিক যখন পার্শ্বে আসিতেছে, তখন জলে লাফালাফি করিতেছে। পথিক তাড়া দিলে তাহাদের আনন্দ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। পথিপার্শ্বে বৃক্ষে দুই একটা বায়স বসিয়া ভিজিতেছে ও মধ্যে মধ্যে কা কা করিতেছে।

অপরাহ্ণে আফিস হইতে ফিরিয়া, ঘরের বাতায়ন-দ্বারে

মুক্ত করিয়া, সারসিগুলা বন্ধ করিয়া, বসিয়া যোগেশ বাবু একটা ছোট হারমোনিয়ম লইয়া, একটা কিছু বাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এটা যোগেশ বাবুর নূতন সখ; মধ্যে মধ্যে তাঁহার এমন এক একটা সখ চাপে। একবার সেতার বাজনা শিখিবার সখ হইয়াছিল; দিন কতক ওস্তাদজি প্রতিদিন গতায়াত করিয়াছিলেন; কিন্তু যোগেশ বাবুর পর্দা জ্ঞান হইয়া উঠিল না। কোন্ পর্দায় অঙ্গুলি দিতে কোন পর্দায় অঙ্গুলি দেন, তাহার স্থিরতা নাই। শেষ একদিন সুকুমারী বলিলেন, "এক বাজাতে পার সে হয়—তা নয়, সময় নেই, অসময় নেই, কেবল ঝন্ ঝন্; কান ঝালাপালা হয়ে উঠ্‌ল।" তাহার পর দিন দুই যোগেশ বাবু অবসর পাইলেই সুকুমারীর কাছে যাইয়া ঝন্ ঝন্ আরম্ভ করিতেন। না পারিয়া, সুকুমারী একদিন মেজরাফটা লুকাইয়া রাখিলেন, যোগেশ বাবুরও সখ মিটিয়া গেল। এখন সেতারটা বাহিরের ঘরে আলমারীর উপর পড়িয়া আছে; তাহার উপর তিন আঙ্গুল ধূলা জমিয়াছে। সেতারের সখ মিটিলে দিন কতক পরে বেহালার সখ আসিল, ক্যাঁ-কোঁর জ্বালায় বাড়ীর লোক অস্থির হইয়া উঠিল। এক দিন সুকুমারীর সহিত কথা কহিতে কহিতে যোগেশ বাবু বেহালার কাণ মোচড়াইতে ছিলেন। অতিরিক্ত টানে একটা তাঁত কাটিয়া গেল, সুকুমারী বলিলেন, "বেশ হইয়াছে।" যোগেশ বাবু সুকুমারীর নাকটা

ধরিয়া নাড়িয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন ; কিন্তু হাতে যে বেহালাখানা ছিল, সে হুঁস না থাকাতে হাত বাড়াইতে বেহালাখানা মেজেয় পড়িয়া জখম হইল। যোগেশ বাবুর বেহালাবাদন সখের সেই শেষ। সুকুমারী সেখানাকে যোগেশ বাবুর বসিবার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। পল্লীপথে যেমন অর্দ্ধপ্রোথিত ভগ্ন মাইল-পাথর দেখিয়া পথের দূরত্ব পরিমাণ করিতে হয়, তেমনই এই ধূলিধূসর সেতার ও ভগ্ন বেহালা দেখিয়া যোগেশ বাবুর সঙ্গীতবিদ্যার পরিমাণ করিতে হয়।

যোগেশ বাবুর তাহার পরের সখটা কিছু স্থায়ী হইয়াছিল, সেটা সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা। তিনি গোড়া পাকা করিবার অভিপ্রায়ে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" ভাল লাগিল না ; তখন ব্যাকরণ ত্যাগ করিলেন। কাব্য দুই তিন খানা শেষ হইল, এমন সময় পাটের সময় আসায় আফিসের কাজ বাড়িয়া গেল—পণ্ডিত মহাশয়কে বিদায় লইতে হইল। তাহার পর এবার হারমোনিয়মের পালা উপস্থিত।

সম্মুখে রক্ষিত একখানা পুস্তকে লিখিত স্বরলিপি দেখিয়া যোগেশ বাবু একটা কি বাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কোন ক্রমেই ঠিক চাবিতে আঙ্গুল পড়িতেছে না। এবং কাজেই যন্ত্রের উদারামুদারাতারা হইতে উৎপীড়িত ললিতকলার আর্ত্ত-চীৎকার উঠিতেছে। যোগেশ বাবুর শ্রবণশক্তির সহিষ্ণুতা

প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই; নহিলে এমন বদসুর কি তিনি বসিয়া শুনিতে পারেন?

যোগেশ বাবু মহা উৎসাহের সহিত বাজাইতেছেন, এমন সময়ে ছেলে কোলে, খাবারের রেকাব হাতে, সুকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সুকুমারীর কোল কখনও শূন্য থাকে না। কোলে একটি ছোট শিশু নাই, সুকুমারীর এ মূর্ত্তি কল্পনা করাই দুষ্কর। সুকুমারীর গণেশজননী মূর্ত্তিই পরিচিত, উমা মূর্ত্তি নূতন নূতন ঠেকে। সুকুমারী, বলিলেন, "বলি বাজালেই কি পেট ভরিবে? আজ কি আর খাইতে দাইতে হইবে না?" যোগেশ বাবু খাবারের রেকাবটা লইয়া হারমোনিয়মের ঢাকার উপর রাখিলেন, রাখিয়া আবার বাজাইতে মন দিলেন। তাহার পর সুকুমারী একগ্লাস জল আনিলেন; তবুও যোগেশ বাবুর বাজনা বন্ধ হইল না। আসল কথা, আফিস হইতে ফিরিবার পথে যোগেশ বাবু প্রভার খবর লইতে গিয়াছিলেন। আহার সম্বন্ধে যোগেশ বাবু বড় সুবোধ ছেলে, যাহা পায়েন, তাহাই খায়েন; সুতরাং সেখান হইতে খাইয়া আসিয়াছিলেন, তাই এখন আর তত চাড় ছিল না। না পারিয়া, সুকুমারী একেবারে পাঁচ ছয় খানা চাবি চাপিয়া ধরিলেন; হারমোনিয়ম চীৎকার করিয়া উঠিল, শব্দ শুনিয়া কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সুকুমারী বলিলেন, "এখন তোমার সুরের সঙ্গে সুর মিলিল, এই

বার গান গাও।" গান গাহিতে যোগেশ বাবুর বিশেষ আপত্তি ছিল, তিনি হাপরে হাওয়া দেওয়া বন্ধ করিয়া আহারে মন দিলেন। ছেলে চুপ করিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ প্রভা কেমন আছে?"

বাক্যব্যয় না করিয়া, যোগেশ বাবু আহার করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো—আজ প্রভা কেমন আছে?"

যোগেশ বাবু আহারে নিবিষ্টচিত্ত।

সুকুমারী খাবারের রেকাবি খানা কাড়িয়া লইলেন।

তখন যোগেশ বাবু বলিলেন, "যদি ভাল খবর দিতে পারি?"

সুকুমারীর অধরপ্রান্তে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "দুইটা সন্দেশ দিব।"

"তাহাতে হয় না।"

"আচ্ছা, যাহা চাহিবে দিব।"

"প্রভার জ্বর ছাড়িয়াছে।"

"সত্য?"

"সত্য নহে ত কি মিথ্যা?"

"কখন ছাড়িল?"

"আজ সকালে।"

যোগেশ বাবু আহার শেষ করিয়া, হারমোনিয়ম ছাড়িয়া, টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া, একখানা খাতা খুলিয়া, তন্মধ্যস্থ লেখা লালকালি দিয়া খস্ খস্ করিয়া কাটিতে লাগিলেন। সুকুমারী বলিলেন, "ও কি ?"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "আফিসের বড় 'সাহেব" বাঙ্গালা শিখিতেছে; ইংরাজী হইতে যে অনুবাদ করিয়াছে, তাহাই আমাকে দেখিতে দিয়াছে।"

"তা সবটাই যে কাটিয়া দিলে !"

"যেমন লেখা। এতেই 'সাহেবের' গর্ব্ব কত! প্রত্যহ আমাকে বলে, 'বাবু, আমি উত্তম বাঙ্গালা শিখিতেছে।' একটা গল্প শুন, একবার এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা গরু চুরির মোকদ্দমা পড়ে। হাকিমের গর্ব্ব ছিল, তিনি খুব ভাল বাঙ্গালা জানেন। তিনি আসামীকে বলিলেন, 'কাঠ-রাস্থ আসামী, তোমার নামে এই নালিশ যে, তুমি ফরিয়াদী নফর মণ্ডলের গরু চুরি করিয়াছ। যদি তুমি অস্বীকার কর, তবে তুমি বদ্‌মায়েস মিথ্যাবাদী আছ।' সে বলিল, 'ধর্ম্মাব-তার, আমি গরু চুরি করি নাই। একদিন ঝগড়া হওয়ায়, আমি উহাকে খড়ম ফেলিয়া মারাতে ও মিথ্যা নালিশ আনি-য়াছে।' হুজুর খড়ম মানে জানেন না, অমনি দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবু, খড়ম কি ?' তিনি বুঝাইয়া দিলে হুজুর বলিলেন, 'খড়ম—কাষ্ঠের পাদুকা! যাহা আমার বার-

বান রামসিং পায়ে দেন। আচ্ছা, তোমার গরু আছে?', সে বলিল, 'আছে, হুজুর।' তখন ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, 'তোমার গরু কতখানি দুগ্ধ দেন?' সে বলিল, 'হুজুর, আমার দামড়া-গরু।' দ্বিভাষীর নিকট দামড়ার অর্থ বুঝিয়া লইয়া প্রভু বলিলেন, 'তিনি পুরুষ গাভী আছেন, দুগ্ধ দিতে পারেন না।'

সুকুমারী হাসিয়া উঠিলেন।

যোগেশ বাবু বলিলেন, "কর্ত্তাদের ত বাঙ্গালায় বিদ্যা এই রূপ। আর আমাদের যদি ইংরাজী বলিতে একটা ভুল হয়, তবে বাবু-ইংলিশের নমুনা পাইয়া কর্ত্তারা আনন্দে কৌতুকে নাচিয়া উঠেন।"

সুকুমারী বলিলেন, "সে কি?"

"আমরা ভুল ইংরাজি বলিলে বা লিখিলে তাহাকেই ইংরাজেরা 'বাবু-ইংলিশ' বলে।"

দুই জনেই হাসিতে লাগিলেন।

সুকুমারী ও যোগেশ বাবুর সুখ ও আনন্দের অভাব ছিল না। তাঁহাদিগের প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ে সুখের অভাব কি? যে প্রেম নহিলে মানবহৃদয় মরুভূমির সহিত উপমেয় হইত, সে প্রেমসুখ তাঁহাদিগের ছিল। প্রেমদীপ্ত হৃদয়ে কখনও সুখের অভাব হয় না। প্রেম সকল সুখ, সকল শোভা, সকল মাধুরীর সার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাতনার উপর যাতনা।

শরৎ লতিকাকে দেখিয়া যাইবার পর হইতে লীলার মুখখানা বড় মলিন হইতে লাগিল। দিন দিন লীলা বড় শীর্ণা, বড় মলিনা হইতে লাগিল। অসুখ করিয়াছে, বলিলে লীলা সে কথা আমলেই আনিত না। তবে লীলা বড় অন্যমনস্কা হইতে লাগিল; সময় সময় লীলাকে কিছু বলিলে সে শুনিতে পায় না; আবার হয়ত শুনিলেও বুঝিতে পারে না। লতিকা বলিত, "মা, তুই হাসিস্‌নে কেন ?" লীলা মেয়ের সঙ্গে খেলা করিতে বসিত, লতিকা সে কথা ভুলিয়া যাইত।

লীলার শাশুড়ী পুত্রশোকে বড় কাতরা ছিলেন; সংসারের বড় কিছু লক্ষ্য করিতেন না। সকল কাজই সুবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী করিতেন। চাকরাণীরা আপনাদের মধ্যে প্রায়ই বলাবলি করিত যে, ছোট বৌমা দিন দিন শুকাইয়া যাই-তেছেন। আহা! সুখের শরীর এত কষ্ট কি সহে? বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বউ; কাঁচা বয়সে এত দুঃখ! সোণার শরীর মাটী হইয়া গেল।

কথায় কথায় কথাটা কর্ত্রীর কাণে উঠিল। তিনি ভাবি-লেন, শোকেই এতটা হইয়াছে। এই সময় একদিন বৃষ্টিতে

ভিজিয়া লীলার জ্বর হইল। গরম দুগ্ধে গোলমরিচের গুঁড়া মিশাইয়া খাইয়া দুই দিনে জ্বর সারিল; কিন্তু একটু কাশি রহিয়া গেল। হিন্দুর ঘরের মেয়েরা, বিশেষ বিধবারা, পীড়া হইলে সহজে তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না; বিধবার পীড়ার চিকিৎসার জন্যও কেহ বড় ব্যগ্র হয়েন না; তাঁহারা যেন অভিশপ্ত জীব। লীলাও অসুখের কথা বলিল না। তবে ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়; বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রবোধের মৃত্যু হইয়াছিল, তাই জ্বর সারিলেও যখন লীলার কাশি সারিল না, তখন সুবোধচন্দ্রের পত্নী সে কথা শাশুড়ীকে জানাইলেন। তিনি সুবোধ বাবুকে বলিলেন।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী গজ গজ করিতে লাগিলেন। প্রবোধের জননীকে বলিলেন, "বলি, তোমারও কি বুদ্ধিশুদ্ধি গেল? বিধবার এত ওষুধ কেন? বড় বাড়াবাড়ি হয়, কবরেজ দেখাও। খৃষ্টানি ওষুধ দিয়ে কি পরকালটাও খোয়াবে? ওরা ছেলে মানুষ, যা খুসি করে; তাই বলে তোমার ত দেখা উচিত।" প্রবোধের জননী কিছুই বলিলেন না; কেবল তাঁহার নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জ্যেঠাইমা বালবিধবা, তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তপনকরের অগম্য স্থানে উদ্ভিদের ফুলফলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ বা প্রেম স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,

বিপত্নীক।

তিনি, পুত্রশোক-কাতরা জননীকে পুত্রের মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া বড়ই কষ্ট দিলেন। কথাটা শুনিয়া সুবোধচন্দ্র ভাবিলেন, "জ্যেঠাইমা কাশী গেলেও বাঁচি।"

প্রথমে লীলা কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহিল না। সুবোধ বাবুর স্ত্রী জিদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লীলা কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহিল না। শেষ না পারিয়া তিনি যখন বলিলেন, "কেন বুড়া শাশুড়ীকে কষ্টের উপর কষ্ট দিবে?" তখন লীলা সম্মতা হইল। যদি ঔষধ না খাইয়া লীলা ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে লীলাকে ঔষধ খাওয়াইতেন।

লীলার কাশি সারিয়া গেল। ডাক্তারের ঔষধে লীলার পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে রক্তিমা ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহার ম্লানমুখে হাসি আর ফিরিল না। লীলার শরীর সুস্থ হইল; কিন্তু তাহার মনে আনন্দ নাই। লীলা লুপ্তগন্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমের মত শোভা পাইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্রের পত্নী ভাবিলেন,—একি?

লীলা কি ভাবিত, জানি না; কিন্তু একা থাকিলেই লীলা ভাবিত। প্রভার পীড়ার সময় একদিন গৃহের মহিলারা প্রভাকে দেখিতে গেলেন; প্রথমে লীলাও বলিল যে, সে যাইবে। কিন্তু তাহার পর সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইল—বড় অসুখ করিয়াছে। সকলে চলিয়া গেলে, লীলা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে-লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে লীলা মুখ তুলিল;

সম্মুখে কক্ষপ্রাচীরে প্রবোধের চিত্র বিলম্বিত। লীলা একবার তাহা দেখিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিল; যেন বড় ভয় পাইয়াছে। সকলে ফিরিয়া আসিলে সে প্রভার কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভুলিয়া গেল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, লীলার ম্লানমুখে হাসি ফুটিল না। লীলা পুস্তক পাঠ ছাড়িয়া দিল, ভাল লাগে না; লীলা সেলাই ছাড়িয়া দিল, ঘাড় ফাটিয়া যায়; সে কেবল একা একা ভাবিতে ভালবাসে। আর কেহ তত লক্ষ্য করিল না, কিন্তু সুবোধচন্দ্রের পত্নী চিন্তিতা হইলেন।

লতিকা প্রায়ই জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে থাকে। তিনি তাহার সহিত খেলা করেন, তাহাকে ফুল তুলিয়া দেন, তাহার সহিত কত গল্প করেন; আর সে তাঁহার কাগজ ছিঁড়িয়া দেয়, বই ফেলিয়া দেয়, তাঁহার কোলে বেড়ায়, তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়। লতিকা তাহার জ্যেষ্ঠতাতের জীবনের আনন্দ। এমনই করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আরও যাতনা।

শরতের প্রভাতে বর্ষারজনী পোহাইল। আবার মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জ্বল রবিকর জ্বলিতে লাগিল; আবার স্রোতস্বতীর তরঙ্গে তরঙ্গে সে কিরণ শতহীরকদীপ্তি ভাঙ্গিতে লাগিল, গড়িতে লাগিল; আবার তরুলতার বর্ষাবারিপাতস্নিগ্ধ ঘনশ্যাম পত্রদলে সে কিরণ জ্যোতিঃ জাগাইতে লাগিল। সোণার ধানে ভরা ধান্যক্ষেত্র, আর শোভাময় অম্বর, একই নদীনীরে পরস্পরের শোভা দেখিতে লাগিল। আকাশ আলোকোজ্জ্বল; কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একখানা পবনতাড়িত লঘুমেঘ গমন-পথে তপনকিরণ কোমল করিয়া দিয়া যায়। ধান্যক্ষেত্রে পবন খেলা করে, নদীনীরে তপনকিরণ খেলা করে, গগনে লঘুমেঘ খেলা করে। প্রকৃতি বর্ষার গম্ভীরতার পর যেন ক্রীড়াকৌতুকিনী হইয়াছে। এ যেন আর গম্ভীরা মাধুরীময়ী যুবতী নহে, এ যেন চঞ্চলা বালিকামাত্র,—মুখে তপন-কিরণের হাসি, মাঝে মাঝে অভিমানে ম্লান হইয়া যায়, অঙ্গে ঘনশ্যাম আবরণ, নদীকলনাদে তাহার তরল হাস্য ছড়াইয়া পড়িতেছে, তারকাজ্যোতিতে তাহার আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে।

বর্ষার পর শরৎ আসিল। প্রভার সামান্য একটু জ্বর আর যায় না। সামান্য একটু ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে প্রভা ম্লান হইতে লাগিল—তপনতাপে যূথিকা যেন শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রতিদিন অপরাহ্ণে সামান্য একটু জ্বর আইসে—অধিক নহে। ডাক্তারেরা বলিলেন যে, সামান্য জ্বর, সহজেই যাইবে। জ্বরের ঔষধ ও টনিক চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। দিন দিন প্রভা শীর্ণা হইতে লাগিল, চক্ষের কোলে কালি পড়িল, আঙ্গুলগুলা লম্বা লম্বা বোধ হইতে লাগিল; গলা লম্বা দেখাইতে লাগিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল; চক্ষুর্জ্বালা, অরুচিও প্রকাশ পাইল।

প্রথম প্রথম প্রভা উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইত, সংসারের কাজকর্ম্মও কিছু কিছু করিত; কেবল অপরাহ্ণে জ্বর প্রকাশ পাইলে শয়ন করিত। কিন্তু ক্রমেই দৌর্ব্বল্য বাড়িতে লাগিল; উঠিয়া বেড়াইতে প্রভা কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। ডাক্তারেরা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্বরের কিছু পরিবর্ত্তন হইল না। দিন দিন প্রভা দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

একদিন কয়জন বড় ডাক্তারকে পরামর্শের জন্য আনা হইল। তাঁহারা রোগিণীকে দেখিয়া পরামর্শ করিলেন; তাহার পর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের নকল দেখিতে চাহিলেন। শরৎ দুই গাদা কাগজ আনিয়া হাজির করিল। চিকিৎসকগণ দুই একখানা

উল্টাইয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর বলিলেন যে, যথেষ্ট ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, এখন রোগীর পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাঁহারা পরামর্শ দিলেন যে, রোগীকে অবিলম্বে পশ্চিমে কোথাও লইয়া যাওয়া হউক।—আর যাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহা করা হউক।

শরৎ পশ্চিমে কয় স্থানে বাড়ী ভাড়া করিতে বন্ধুবর্গকে টেলিগ্রাফ করিল। এদিকে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। কোনও পারিবারিক কারণবশতঃ শরতের জননীর যাইতে হইলে বড় অসুবিধা হয়, কাজেই শরৎ একাই প্রভাকে লইয়া যাইবে, স্থির হইল। অন্য কেহ সঙ্গে গেলে আবার প্রভার অসুবিধা হইবে, এবং তাহাতে তাহার প্রফুল্লতার হানি হইতে পারে। স্থির হইল যে, বসন্তকুমার তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

একদিন পরে এলাহাবাদ হইতে শরতের এক বন্ধু টেলিগ্রাফ করিলেন যে, তিনি যমুনাকিনারে একটা বাঙ্গ্‌লা স্থির করিয়াছেন। সেইদিন রাত্রিতে প্রভাকে লইয়া শরৎ এলাহাবাদে যাত্রা করিল। স্নেহশীল বসন্তকুমার তাহাদের সঙ্গে গেলেন। তাহাদিগকে এলাহাবাদে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

এলাহাবাদে যাইয়া জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে প্রভা প্রথমে একটু সুস্থ বোধ করিল। শরতের বড় আশা হইল। সারাদিন শরৎ প্রভার কাছে থাকিত। বাঙ্গলার অনতিদূরেই নদী

গ্রীষ্মকালে বালুবহুল বেলা-পার্শ্বে রজতসূত্রবৎ প্রতীত হয়; এখন আর সে রূপ নাই, এখন বর্ষাবারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে; এখন আর কুঞ্জপ্রহ্লাদিনী চঞ্চলা বালিকা মূর্ত্তি নাই—এখন যৌবন-জলরাশিভরা যুবতী মূর্ত্তি। দূরে যেখানে যেখানে তীরের ভগ্নচিহ্ন বিদ্যমান, সেখানে সেখানে নীল জলে শ্বেত ফেনরাশি দৃষ্ট হয়। পরপারে শ্যামশোভাময় বৃক্ষলতা গগনের নীলিমা স্পর্শ করিতেছে। এই নদীকলতানমুখরিত স্নিগ্ধ শোভার মধ্যে আসিয়া প্রভার নগরদৃশ্য-ক্লান্ত নয়ন বিশ্রাম পাইল। প্রভা আবার একটু সবল হইল। বাতায়নে দাঁড়াইয়া প্রভা প্রকৃতির শোভা দেখিত। তরঙ্গ তুলিয়া নদী বহিয়া যাইত, তরুলতা মর্ম্মর রব তুলিয়া কম্পিত হইত – প্রভা দেখিত।

শরৎ প্রভাকে কত কি দেখাইত; ঐ শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া নদীর উপর দিয়া একদল বক উড়িয়া গেল। ঐ দূরে জলচর বিহঙ্গমগণ জলমধ্যে আহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। প্রভার বড় ইচ্ছা হইত যে, সে একবার শরতের সহিত যাইয়া জ্যোৎস্নালোকে নদীর শোভা দেখিয়া আসিবে। কিন্তু শরৎ বলিত যে, আর দিনকতক না যাইলে, তাহা হইবে না; কারণ এই দুর্ব্বল শরীরে শ্রমে ও শীতল বাতাসে তাহার অসুখ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এখানে আসিয়া প্রভার কেবল শরতের ওকালতির স্থানের কথা মনে পড়িত; সেখানেও এমনই মুক্ত

বিপত্নীক।

স্বাধীনতা, সেখানেও এমনই প্রকৃতির উদার শান্তশোভার মধ্যে দুইটি প্রাণী—সেখানে তাহাদের সুখের সীমা ছিল না।

সাত আট দিন পরে প্রভা আরও একটু সবল বোধ করিতে লাগিল। পিতার অনুরোধমত সে স্বহস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিল; শরতের ভ্রাতৃবধূকে পত্র লিখিল; তাঁহার ছেলেমেয়েদেরও একখানা পত্র লিখিল। শরৎ মধ্যে মধ্যে কোন পুস্তক হইতে কিছু কিছু পড়িয়া প্রভাকে শুনাইত, কিন্তু অধিক শুনাইতে তাহার সাহস হইত না, পাছে প্রভা শ্রান্তা হয়। এক একদিন সখ্ করিয়া প্রভা একটু হারমোনিয়ম বাজাইত, অল্পক্ষণ বাজাইয়াই শ্রান্তি অনুভব করিত। তাহার কপালে স্বেদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া শরৎ তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিত। অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে একখানা কৌচে শয়ন করিয়া প্রভা শুনিত, যন্ত্রোদ্ভূত স্বরের সহিত শরতের সুকণ্ঠনিঃসৃত স্বর মিশিয়া কক্ষমধ্যে সুস্বরের তরঙ্গ তুলিতেছে।

এমনই করিয়া প্রথম দিন পনের কাটিয়া গেল। প্রভা ক্রমে সুস্থবোধ করিতে লাগিল; শরতের মুখ হইতে চিন্তার ছায়া অপসৃত হইতে লাগিল।

তাহার পর প্রভা আবার একটু অসুখ বোধ করিতে লাগিল। প্রভা ভাবিল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সে অসুখের কথা প্রকাশ করিল না। একদিন প্রভা একবার নদীতে নৌকায় বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; শরৎ

এলাহাবাদের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া একদিন অপরাহ্নে প্রভাকে নৌকায় বেড়াইতে লইয়া গেল। যেখানে যমুনা ও জাহ্নবী মিশিয়াছে, ধীরে ধীরে তরণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহ্নবীর শ্বেত সলিল আর যমুনার নীল নীর মিশিয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। তখন অস্তগমনোন্মুখ তপনের করজালপ্রভায় সেই সলিলরাশি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভা নৌকার মধ্য হইতে ঝুঁকিয়া দেখিল; সে শরৎকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। শরৎ তখন নদীনীরসংলগ্নদৃষ্টি হইয়াছিল—কিছুই লক্ষ্য করিল না।

সন্ধ্যার পূর্বেই প্রভা ও শরৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। শ্রান্তি অনুভব করিয়া গৃহে ফিরিয়া প্রভা একখানা কৌচে শুইয়া পড়িল। শরৎ তাহার শিয়রে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল; তাহার পর প্রভা বলিল, "আমি মরিলে কি তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে?"

শরৎ চমকিয়া উঠিল। রোগক্লিষ্টার মুখে এ কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হয়? প্রভার দুইখানা হাত আপনার দুই হাতের মধ্যে স্থাপন করিয়া শরৎ বলিল, "তুমি মরিলে জগতে আমার আর কি বন্ধন থাকে? মরিবার কথা কেন প্রভা?

"কেহ ত চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না।"

"কেন প্রভা, তোমার কি মরিতে ইচ্ছা করে?"

বড় কাতরস্বরে শরৎ কথা কয়টা বলিল। প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল, "তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া, আমার মরিতে ইচ্ছা করে না। তোমায় ছাড়িয়া আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না।"

শরতের কোলে মুখ লুকাইয়া প্রভা কাঁদিতে লাগিল। প্রভার মুখ তুলিয়া শরৎ তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল—সে অশ্রু যেন আর থামে না। প্রভা আর যাহা বলিতে ভাবিয়াছিল, তাহা আর বলা হইল না।

তাহার পরদিন শরৎ বুঝিতে পারিল, প্রভার আবার জ্বর হইতেছে। শরৎ কলিকাতায় দাদাকে সে কথা লিখিল, এবং এলাহাবাদে প্রভার চিকিৎসা করাইতে লাগিল।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না। প্রভা আবার অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। কয় দিন পরে জ্বর একটু বাড়িল। ডাক্তার বলিলেন যে, তিনি রোগীকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে পরামর্শ দেন, কারণ সেখানে চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যের বন্দোবস্ত ভাল হইবার সম্ভাবনা। ইহা একটা ছুতা মাত্র। ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন, রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা বড় নাই। প্রভাও তাহাই বুঝিয়াছিল। ডাক্তারের কথা শুনিয়া শরৎ বসন্তকুমারকে টেলিগ্রাফ করিল। কলিকাতা হইতে বসন্তকুমার ও প্রভার পিতা আসিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

কলিকাতায় যাইয়া প্রভার চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু জ্বরও চলিতে লাগিল। প্রভা দিন দিন অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শরৎ লক্ষ্য করিতে লাগিল যে, দিন দিন প্রভার জীবনীশক্তি ও তাহার সহিত তাহার সুখের আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফুরাইল।

প্রভা দিন দিন শুকাইতে লাগিল—কোমলা যূথিকা শুকাইয়া উঠিল। প্রভা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এবার শরৎ তাহা বুঝিতে পারিল, কারণ চিকিৎসকগণ স্পষ্টই বলিলেন যে, এখন ঔষধ দিয়া যে দুই দিন রোগীকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, সে কয় দিন কেবল তাহার যাতনা বাড়ান হইবে—রোগ চিকিৎসাতীত। শরৎ প্রভার সমক্ষে প্রফুল্লভাব দেখাইতে চেষ্টা করিত; কিন্তু অন্তরালে যাইয়া অশ্রুমোচন করিত। শরৎ দেখিল, তাহার সকল সুখ—সকল আশার সমাধি হইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরৎ রোগীর শিয়রে বসিয়া আছে—কক্ষে আর কেহ নাই। তখন সূর্য্য কেবল অস্ত গিয়াছে; অস্তগত সূর্য্যের মরণাহত করজালে তখনও অসীম অম্বর উজ্জ্বল,—গগনপ্রান্তে ম্লান চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কক্ষমধ্যে তখনও দীপ জ্বালা হয় নাই—সন্ধ্যার ম্লানালোক ঘরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দুই জনই স্থির, দুই জনই নীরব। আপনার শীর্ণ হস্তে শরতের হস্ত ধরিয়া, অতি ক্ষীণ, অতি

কোমল, অতি করুণস্বরে প্রভা শরৎকে বলিল, "আমি মরিলে তুমি আবার বিবাহ করিবে ?"

ম্লান আলোক প্রভার শীর্ণ বদনে পতিত হইয়াছে, পবন-স্পর্শে তাহার তৈলবিনারুক্ষ ললাটবিলুণ্ঠিত কেশ কম্পিত হইতেছে; শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া প্রভা বলিল, "আমি মরিলে তুমি আবার বিবাহ করিবে ?"

প্রভার কথা শুনিয়া শরৎ বুঝিল যে, প্রভা বুঝিয়াছে, সে আর বাঁচিবে না। কিছুক্ষণ শরৎ কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু সে চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না—দুই ফোঁটা অশ্রু প্রভার কপালে পড়িল, তাহার পর আরও দুই ফোঁটা পড়িল। প্রভা বলিল, "আমি না বুঝিয়া তোমায় বড় কষ্ট দিয়াছি। আমি কখনও তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না। তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ লইয়াই মরিলাম।"

শরৎ বলিল, "কেন প্রভা ?"

"কবে তুমি আমায় লইয়া সুখী হইলে ? আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর কালি হইয়া গিয়াছে। তুমি সব ছাড়িয়া আমায় লইয়া বিদেশে ফিরিয়াছ, একবারও বিশ্রাম পাও নাই। সময়ে আহার নিদ্রা—তাহাও হয় নাই, চিন্তার ত অবধি ছিল না।"

"ও কথা বলিও না, প্রভা।"

বিপত্নীক।

"একদিনের জন্য আমি তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না। আমায় লইয়া তোমার কেবল ভাবনা—কেবল ভাবনা। তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না।"

"প্রভা, তোমাকে লইয়া আমি যে সুখ ভোগ করিয়াছি, সে সুখভোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? তোমাকে লইয়া আমি অনন্ত সুখে সুখী হইয়াছি। আজ তুমি কেন ও কথা বলিতেছ?

"স্ত্রীলোকের যেন তোমার মত স্বামী হয়!"

শরৎ আর কিছু বলিল না—কেবল মুখ নত করিয়া প্রভার শীর্ণ অধর চুম্বন করিল। তাহার পর উঠিয়া কক্ষে দীপ আনিতে বলিয়া, বাতায়ন রুদ্ধ করিল।

তাহার পর দুই দিন গেল। তৃতীয় দিন প্রভা শরৎকে বলিল, "আমি মরিলে তুমি লীলাকে বিবাহ করিবে?

শরৎ বলিল, "আমি আর বিবাহ করিব না। মরিবার কথা ভাবিতেছ কেন?"

"বিধবাবিবাহে দোষ কি?"

"আমি বিবাহ করিব না।"

"সে ত তোমায় ভালবাসে।"

"ছিঃ প্রভা, ও কথা কেন?"

"কেন বিবাহ করিবে না?"

"প্রভা, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিয়া সুখ পাও যে, বার বার মৃত্যুর কথাই ভাবিতেছ?"

শরতের কথা শুনিয়া প্রভা নীরব হইল। যখন কাতর-ভাবে শরং বলিল, "প্রভা, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিয়া সুখ পাও যে, বারবার মৃত্যুর কথাই ভাবিতেছ?" তখন প্রভা বুঝিল যে, তাহার কথায় শরৎ বড় ব্যথা পাইয়াছে। এত রোগ যাতনা সহ্য করিয়াও, প্রভা যে শরংকে বলিয়াছিল, "তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না," সে কথা সত্য। শরংকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার কথা ভাবিলেও তাহার কষ্ট হয়। সে কি ইচ্ছা করিয়া শরংকে কষ্ট দিতে পারে? প্রভা বলিল, "আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি, রাগ করিও না।"

শরৎ বলিল, "প্রভা, তুমি মরিবার কথা ভাবিও না।"

"আমি ত মনে করি, ভাবিব না; কিন্তু না ভাবিয়া যে থাকিতে পারি না। আমি কি বুঝি না যে, আমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে যাইতেই হইবে? আমার সাধ্য থাকিলে কি আমি তোমার কাছ হইতে যাই? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

শরৎ কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। ঢোক গিলিয়া শরৎ ধীরে ধীরে প্রভার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেল। আপনার বসিবার ঘরে যাইয়া শরৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিল। শরতের মনে এতই কষ্টবোধ হইতেছিল যে, তাহার ক্রন্দনও আসিল

বিপত্নীক।

না। খানিকটা কাঁদিতে পারিলে সে একটু শান্তি বোধ করিতে পারিত—মনের একটু ভার-লাঘব হইত; কিন্তু তাহা হইল না। বাহিরে যাইয়া ছাদে একখানা আরাম-চেয়ারে বসিয়া শরৎ কত দুশ্চিন্তাই করিতে লাগিল।

আরও পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, প্রভা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—তাহার যন্ত্রণা আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সহিষ্ণু রমণী নীরবে সকল সহ্য করিতে লাগিল। পাছে শরৎ কষ্ট পায় বলিয়া একবারও উঃ আঃ করিল না। চিকিৎসকগণ দেখিয়া বলিয়া গেলেন যে, রোগী আর চার পাঁচ দিনের অধিক বাঁচিবে না। আর ঔষধ দিয়া কোনও ফল নাই। কেবল যন্ত্রণানিবারণার্থ ঔষধ দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু যন্ত্রণার কোন রূপ উপশম লক্ষিত হইল না। এখন যে কয় দিন জীবন থাকে, সে কয় দিন কেবল যাতনা ভোগ করা।

প্রভার জীবনে মধ্যাহ্নেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল—শরতের আশা বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইতে চলিল।

আরও একদিন প্রভা শরৎকে বিবাহের কথা বলিল। প্রভা বলিল, "আমি মরিলে, তুমি বিবাহ করিও।"

শরৎ কেবল বলিল, "না।"

"কেন?"

"প্রভা ও কথা আমাকে বলিও না।"

"কেন অসুখী হইবে?"

"তোমাকে হারাইলে কি আর আমি সুখের আশা করিতে পারিব? তখন আমাদিগের বিবাহিত জীবনের সুখের স্মৃতিই কেবল আমার সুখ হইবে।"

প্রভার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল। স্বামীর এইরূপ প্রেম লইয়া মরিতে পারিলে কোন্ রমণী না সুখী হইবেন? প্রভা শরতের হাত তুলিয়া আপনার কপালের উপর রাখিল, তাহার নয়নদ্বয় একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রভা শরতের মুখের দিকে চাহিল। শরৎ তাহার মুখচুম্বন করিল।

পরদিন প্রভার জ্বর অত্যন্ত বাড়িল, চিকিৎসকগণ বলিয়া গেলেন যে, এই জ্বরেই রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু। শরৎ শুনিল—স্থির অবিকম্পিতকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা?" সন্ধ্যার পর জ্বরত্যাগকালে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, এই মত ব্যক্ত করিয়া চিকিৎসকগণ তখন চলিয়া গেলেন। শরৎ আজ অত্যন্ত স্থির, অত্যন্ত গম্ভীর—যেন ঝটিকার পূর্ব্বে স্তব্ধ সাগর।

সন্ধ্যার সময় হইতে শরৎ একবারও রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিল না, প্রভার জ্বর সমান রহিল। সন্ধ্যার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে জ্বরত্যাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল; প্রভা কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল—তাহার পাণ্ডুবর্ণ

বদনে স্বেদচিহ্ন লক্ষিত হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রভা স্থির হইল, তাহার দক্ষিণ হস্ত ঘুরিয়া আসিয়া যেখানে শরৎ বসিয়াছিল, সেইখানে পড়িল। শরৎ আপনার হস্তে তাহার হস্ত তুলিয়া লইল, প্রভা তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল। যে আনন্দে, যে আশায়, যে প্রেমে সে জীবনের চিরনির্ভর বলিয়া শরতের হাত ধরিয়াছিল, যেন সেই আনন্দে, সেই আশায়, সেই প্রেমে সে আজও মরণের কূলে শরতের হাত ধরিল। সে অনন্ত আনন্দ, সে অনন্ত আশা, সে অনন্ত প্রেম, সে কি ভুলিবার! আজ যেন সে জীবনসম্বল সেই প্রেম মরণ-সম্বল করিয়া লইতে চাহে!

সেই শীর্ণ হাতখানি হাতে লইয়া শরৎ বসিয়া রহিল; প্রভার নয়ন শরতের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইল। এমনই করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল চলিয়া গেল, প্রভা নড়িল না। শরতের মাতা প্রভার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন— দেহ শীতল! দেহে প্রাণ নাই! শরৎ স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। প্রভার মৃতদেহ নদীতীরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রভা শরতের হাত ধরিয়া আছে। প্রভার দৃষ্টি শরতের মুখের উপর আসিয়া স্থির হইয়াছে।

দেহ দাহস্থানে লইবার উদ্যোগ হইলে, শরৎ ধীরে ধীরে আপনার হাত হইতে প্রভার হাত ছাড়াইল; ধীরে অতি ধীরে সে হস্ত শয্যার উপরে স্থাপিত করিল—পাছে প্রভা

ব্যথা পায়। তাহার পর শরৎ তাহার মুখের উপর হইতে অতি ধীরে চুলগুলা সরাইয়া দিল—আর এক বার প্রভার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিল। প্রভা, জীবনেও যেমন,মরণেও তেমনই তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

শরৎ শবের সঙ্গে সঙ্গে দাহস্থানে গমন করিল, বসন্তকুমার নিবারণ করিতে সাহস করিল না। শরৎ নির্ব্বাক্ তাহার নয়নে অশ্রু নাই। শরৎ দাহস্থান হইতে ফিরিয়া আসিল—তাহার নয়ন অশ্রুচিহ্নহীন।

প্রস্তররুদ্ধমুখ প্রস্রবণের মত শরৎ স্থির। আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া শরৎ দ্বার রুদ্ধ করিল। এই বার অশ্রুর উৎস মুক্ত হইল,—শয্যায় পড়িয়া শরৎ কাঁদিতে লাগিল। চারিদিকে প্রভার স্মৃতি, প্রাচীরে সুন্দর সুন্দর শিশুর ছবি, প্রভা সন্তানসম্ভবা হইলে শরৎ এই সকল ছবি কক্ষপ্রাচীরে টাঙ্গাইয়াছিল। টেব্‌লের উপর প্রভার একখানা পুস্তক পড়িয়া আছে, সেদিন প্রভা একটা ছত্র বুঝাইয়া লইয়া পুস্তকখানা ঐখানে রাখিয়াছিল। ফুলদানিতে ফুলগুলা শুকাইয়া গিয়াছে। আর যে সেগুলা সাজাইয়াছিল, সে আজ কোথায়? শরতের বোধ হইল, যেন সে কার্পেটের উপর প্রভার পদশব্দ শুনিতে পাইল—বুঝি প্রভা আসিতেছে! শরৎ মুখ তুলিল, এখনও উপাধানে কেশগুচ্ছের সৌরভ, অতি ক্ষীণ, যেন বিশুষ্ক কুসুমের সৌরভ। শরৎ কাঁদিতে লাগিল।

বিপত্নীক।

শরতের সে দিনের ডায়েরীর পৃষ্ঠাটা আগাগোড়া অশ্রু-চিহ্নিত। তাহারই মধ্যে অস্পষ্ট অক্ষরে কম্পিতহস্তে লেখা রহিয়াছে—"আজ এই বিশাল জগতে আমি একাকী।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার দূরে।

প্রভার মৃত্যুর পর কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারী আপনার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যোগেশ বাবু বড় ব্যথিত হইলেন। কেন জানি না, শরতের সকল পরিচিতই শরৎকে ভালবাসিতেন। তাহার দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইলেন। যদি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের সহানুভূতি পাইলে শোককাতর হৃদয় কিছু শান্তি পাইতে পারিত, তবে শরতের তাহার অভাব হইত না। কিন্তু শোকের কি অংশ হয়? আপনার শোকে শরৎ আপনি ম্লান হইতে লাগিল।

প্রভার পিতার অনুতাপের আর সীমা রহিল না। তিনি কন্যাকে অযত্ন করিয়াছিলেন, এখন সেই জন্য বড় কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। প্রভার মাতার শোকের অবধি রহিল না।

যে শুনিল, সে ই "আহা" বলিল। প্রবোধের জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীও শুনিয়া বলিলেন, "আহা—মেয়েটি বড় ধীর শান্ত ছিল—যেন ভগবতী। কপালে সুখ নাই, তার কি হবে! বড় নম্র ছিল—আমাদের বাড়ীর ধিঙ্গি বৌদের মত নয়।" প্রবোধের জননী বলিলেন, "শরৎ বোধ হয় বড় কষ্ট পাইবে।" সুবোধ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তা ত বটেই। শরৎ যেমন করিয়া

স্ত্রীর শুশ্রূষা করিয়াছিল, তেমন কেহ কাহারও করিতে পারে না। লতিকা জ্যেঠা মহাশয়কে বলিল, "জ্যেঠামণি, চল আমরা কাকাকে দেখ্‌তে যাব। বাবা যেখানে গেছে, কাকিমাও কি সেখানে গেল? কাকিমা কোলে কর্‌ত।" সুবোধ বাবু বলিলেন যে, একদিন শরৎকে দেখিতে যাইবেন।

প্রভার মৃত্যুর পর কয় দিন শরৎ কাহারও সহিত দেখা করিল না—আপন শয়নকক্ষেই রহিল। কলিকাতায় শরতের পরিচিতদিগের সংখ্যা অল্প নহে, অনেকেই তাহার সংবাদ লইতে আসিতেন। এ সময় কাহারও সহিত দেখা করিতে শরতের ইচ্ছা হইত না—প্রভার স্মৃতি এবং স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সময় কাটাইতেই সে ভালবাসিত।

কয়দিন পরে একদিন নিশাশেষে শরৎ নদীতীরে গেল। তখনও সহর সুপ্ত। দুই একটা বিহগ জাগিয়া প্রভাতী গাহিতেছে। শরৎ গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। যেখানে একদিন প্রবোধ ও সে বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেখানে তৃণোপরি শিশিরবিন্দু শোভা পাইতেছে। শরৎ আকাশের দিকে চাহিল, তখনও আকাশে ম্লান চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে; তারকার জ্যোতিঃ নিবিয়া আসিতেছে; সলিলসংস্পর্শশীতল পবন বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া বহিতেছে। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া শরৎ একবার আকাশের দিকে চাহিল, একবার নদীর দিকে চাহিল; আর ভাবিল।

ভাবিল যে, তাহার পত্নী—তাহার বন্ধু কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া শরৎ বহুদিন পরে একটা কবিতা, লিখিল। সে লিখিল,—

আজি নিশি-অবসানে চাহিয়া আকাশপানে
কেন এ কাতর প্রাণে কাঁপে ব্যাকুলতা,
কাতর নয়ন দুটি আঁখি জলে উঠে ফুটি'
ব্যাকুল হৃদয় টুটি' জাগে কেন ব্যথা ?

যেন কি আকুল আশা হৃদয়ে জাগায় তৃষা
ব্যথাময় ভালবাসা উঠেছে কাঁপিয়া!
যেন এ কাতর বুকে বাসনা শুকায় দুখে,
যেন চাহি কার মুখে কি গেছি ভুলিয়া!

যেন কি করিতে গিয়ে ভুলে আছি এ কি নিয়ে
তাই এ কাতর হিয়ে হতেছে ব্যাকুল!
তাই চাহি নীলাম্বরে আজি আঁখি-জল ঝরে
হৃদয় কিসের তরে হতেছে আকুল!

এখনো দিবস হাসে, এখনো যামিনী আসে,
এখনো ফুলের পাশে গুঞ্জরে ভ্রমরা,
এখনো তরঙ্গ তুলে নদী চাহে দুই কূলে,
শ্যাম তৃণে, স্নিগ্ধ ফুলে, দুই কূল ভরা;

'বিপত্নীক।

এখনো সে চাঁদ উঠে, কুমুদ তেমনি ফুটে,
ধেনু আসে, যায় গোঠে প্রভাতে সন্ধ্যায়;
এখনো উদিলে রবি মোহন মাধুরী ছবি
নলিনী পরাণ লভি আঁখি মেলি চায়;

এখনো ব্যাকুল বায় করে শুধু হায় হায়
মেঘমালা আসে হায় অনন্ত গগনে,
এখনো বিহগ গান আকুলিত করে প্রাণ
মনে পড়ে প্রাণদান প্রথম যৌবনে।

এখনো তারকামালা নীলাকাশ করে আলা
চঞ্চলা কিরণবালা মুখভরা হাসি;
এখনো এ বসুন্ধরা আকুল পুলকভরা
তরুশাখে মনোহরা তাই ফুলরাশি;

এখনো পবন পর ভাসে বাঁশরীর স্বর
সুখশান্তিদীপ্ত নর গাহিতেছে গান;
এখনো হৃদয় ঘিরি' ফুটে প্রেম ধীরি ধীরি
প্রেমিকা চাহিয়া ফিরি' মুদে দুনয়ান।

শুধু এ কাতর প্রাণ চাহিছে বিরাম-স্থান
জলভরা দু' নয়ান উঠে ব্যাকুলিয়া;
হৃদয়ে যে দিকে চাই বিজন হেরিতে পাই
কাতর হৃদয় তাই উঠে আকুলিয়া।

সে দিন তাহার যে কয় জন বন্ধু তাহার সংবাদ লইতে আসিলেন, শরৎ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাঁহাদিগের দয়ার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিল।

তাহার পর দুই দিন শরৎকে যেন একটু সুস্থ বোধ হইল।

তৃতীয় দিবস শরৎ ভ্রাতার নিকট এক বার দেশভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া বসন্তকুমার আনন্দিত হইলেন, যদি শরৎ শোক সামলাইতে পারে। তিনি প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন যে, শরৎ একেবারে অধীর হইয়া পড়িবে; কিন্তু শরতের ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি সম্মতি দিলেন।

অন্তরে দারুণ শোক লইয়া শরৎ দেশভ্রমণে বাহির হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লীলা।

লীলা প্রভার মৃত্যুর সংবাদ শুনিল; সে তাহাতে দুঃখ বা আনন্দ কিছুই প্রকাশ করিল না। তবে সেই সংবাদ শুনিয়া কয় দিন লীলা বড় অন্যমনস্কা রহিল—লীলার হৃদয়াকাশে মেঘ-সমাগম হইতে লাগিল।

তাহার পর এক দিন লীলা শুনিল যে, শরৎ দেশভ্রমণে গিয়াছে; সেই সঙ্গে লীলা ইহাও শুনিল যে, শরতের প্রথম শোকোচ্ছ্বাস যেন কিছু প্রশমিত হইয়াছে। লীলা কি ভাবিল, জানি না; কিন্তু সে আবার কতকগুলা পুস্তক বাহির করিল। সে গুলা সবইযে লীলা পড়িবে বলিয়া বাক্স হইতে বাহির করিল, তাহা নহে; সেজন্য সে একখানা পুস্তক বাহির করিল—অন্য গুলা দেখাইবার জন্য। কাহাকে দেখাইবার জন্য? কে দেখিবে? হয় ত কেহই নহে, তবুও লীলার কেমন একটু সন্দেহ বোধ হইতে লাগিল। সে পুস্তকখানা পাঠ করায় তাহার একটু বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাই একটু আশঙ্কা আসিয়াছিল। নবোঢ়া বালিকা স্বামীর নাম লিখিয়া শতবার মুছিলেও ভয় করে, বুঝি এখনও দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক সেখানে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই—তবুও লজ্জা ও অন্যের দৃষ্টিপথে পতিত হইবার

আশঙ্কায়, সে দেখে, যেন এখনও একটু দাগ রহিয়াছে, লোকে কি বলিবে! তেমনই লীলাও ভাবিল যে, সে যদি কেবল "বিষবৃক্ষই" পাঠ করে, তবে লোকে কি ভাবিবে?

লীলা পুস্তকগুলা বাক্স হইতে বাহির করিবার সময় বাক্সস্থিত প্রবোধের ফটোগ্রাফের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মুহূর্ত্তমাত্র লীলা সেই চিত্রের দিকে চাহিল। সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই মৃদুহাস্যলিপ্ত অধরোষ্ঠ, সেই দীপ্ত নয়ন; লীলার বোধ হইল, যেন সেই চিত্রান্তরাল হইতে প্রবোধ তাহার দিকে চাহিয়া আছে; যেন প্রবোধ বলিতেছে—এই কি আমার প্রেমের প্রতিদান? সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ বারান্দায় একটা কাকাতুয়া ছিল; লীলা আপনি সেটাকে খাবার দিত, তাহার গাত্রে হাত বুলাইত, আর সময় সময় তাহার মুখে চক্ষে জল ছিটাইয়া দিত। কাকাতুয়া অনেক কথা বলিত; মানুষের মত হাসিত, কাশিত, কথা কহিত, আবার প্রবোধের মৃত্যুর পর তাহার মাতার ক্রন্দন শুনিয়া এখন কাঁদিতেও শিখিয়াছিল। এই সময় সহসা কাকাতুয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। পূর্ব্বে পাখীটা প্রবোধের বসিবার ঘরের সম্মুখে থাকিত, তাহার স্বরও কতকটা প্রবোধের স্বরের মত হইয়াছিল। তাহার উচ্ছ্বসিত হাস্যরবে লীলা চমকিয়া উঠিল—তাহার চাঞ্চল্যে প্রবোধ হাসিয়াছে! অভিমানিনী লীলা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিলে প্রবোধ হাসিত—আজ সে তাহার

হৃদয়ের পরিবর্ত্তনেও তেমনি হাসিয়া উঠিয়াছে! তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালাটা ঝপ করিয়া ফেলিয়া লীলা দ্রুতপদে বাহিরে আসিল। তখনও লীলার কপালে স্বেদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। লীলা বারান্দায় আসিলে কাকাতুয়া আর এক বার হাস্যো-চ্ছাস তুলিল—যেন লীলা এত সামান্য কারণে ভয় পাইয়াছে দেখিয়া, তাহার দুর্ব্বলতার জন্য বিদ্রূপ করিয়া পাখী হাসিয়া উঠিল। লীলার বোধ হইল, যেন সে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহার জন্য দুঃস্বপ্নের দ্বার মুক্ত। সেই নিশীথে আপনার রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে লীলা "বিষবৃক্ষ" পড়িতে লাগিল। এক মনে লীলা পড়িতে লাগিল—কত রাত্রি হইল জানিতেও পারিল না। পুস্তক শেষ করিয়া লীলা একবার কুন্দের কথা ভাবিল, সেই অপ্রস্ফুট কুসুমকলিকার কথা ভাবিয়া লীলা শিহরিয়া উঠিল। পুস্তক রাখিয়া বসিয়া লীলা কি ভাবিতে লাগিল।

সেই সময় বাহিরে একটু বেগে বাতাস বহিল; বারান্দার মধ্য দিয়া হুহু করিয়া বাতাস বহিয়া গেল। লীলা চমকিয়া উঠিল—যেন সে সেই নিশীথ নীরবতার মধ্যে কাহারও কাতর দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইল! সেই বাতাসে দাঁড় নড়িলে কাকাতুয়া জাগিয়া উঠিল—জাগিয়া সে ক্রন্দনের সুর তুলিল। সেই নৈশনীরবতার মধ্যে বিহগকণ্ঠোদ্ভূত অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি অস্ফুটতর হইয়া লীলার শ্রবণে প্রবেশ করিল। সেই নীরবতা,

সেই পবনের হুহু স্বর, আর সেই বিহগের ক্রন্দনধ্বনি, এই সকল সম্মিলিত হইয়া লীলার হৃদয়ে এক বিচিত্র ভাব আনয়ন করিল। লীলা ভাবিল, যেন দূরে—অতি দূরে কে মৃত্যুর শতস্তরতিমিরাবৃত গহ্বরমধ্য হইতে যাতনার্ত্ত ক্রন্দন তুলিতেছে—তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীর কম্পন হইতে ক্রন্দন উঠিতেছে; তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃতদিগের স্তূপাকার অস্থিরাশির মধ্য হইতে একটা যাতনা, একটা বেদনা, একটা মর্ম্মপীড়া যেন আপনাদের প্রকাশ করিতে পারিতেছে না; তাই সেই আলোকহীন অন্ধগহ্বরতল হইতে বেদনার আর্ত্ত ক্রন্দন উঠিতেছে।

লীলা ভয়চকিত নেত্রে কক্ষের চারি দিকে চাহিল; কেহই নাই, কেবল তাহার দুহিতা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, আর তাহারই জননী দুশ্চিন্তাপীড়িত হৃদয়ে বসিয়া নিশা কাটাইতেছে।

কক্ষমধ্য বেশ শীতল; কিন্তু লীলার বোধ হইল, যেন সে অসহনীয় উত্তাপময় কক্ষে বসিয়া আছে। উন্মাদিনীর মত দ্বার মুক্ত করিয়া লীলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। লীলার দ্রুতপদশব্দে চমকিয়া কাকাতুয়া বলিল "হ্যাগা, তুমি কে গা?" লীলা চাহিয়া দেখিল, কাকাতুয়া। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল—সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে—উষালোকবিকাশের পূর্ব্বে

বিপত্নীক।

অন্ধকার যেন একটু ঘন হইয়া আসিয়াছে। আকাশে তারকা-গুলি পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। শীতল বাতাসে লীলার কপালে স্বেদবিন্দু সকল লুপ্ত হইল। লীলা পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিল। তখনও লতিকা ঘুমাইতেছে, তাহার নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম তাহার অমল শুভ্র বদনে ও তাহার অমল শ্বেত শয্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাহার ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠমধ্যে শ্বেত দন্তপাঁতি দেখা যাইতেছে, কক্ষ-মধ্যস্থ দীপালোকে তাহার নবনীতকোমল দেহের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মুগ্ধনেত্রে লীলা একবার দুহিতাকে দেখিল। লীলার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ অত্যন্ত প্রবল। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া লীলা হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিল; প্রভাতপবনস্পর্শে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

"মা, মা" রবে লীলার ঘুম ভাঙ্গিল; সে জাগিয়া দেখিল, বেলা হইয়াছে, লতিকা তাহাকে ডাকিতেছে।

লীলার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাসে অবিশ্বাসে।

ছয় মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া শরৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যেই শরৎ তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিল। সে ওকালতি ছাড়িয়া দিল, সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। এতদিন শরতের মনোমধ্যে যে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, দেশভ্রমণকালে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দুঃস্থ দুর্দ্দশার চিত্র সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়; সকলে সে সকল লক্ষ্য করে না। দেশভ্রমণকালে শরতের মনের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে তাহার সে সকল লক্ষ্য করিবারই কথা। শরৎ সে সকল লক্ষ্য করিয়াছিল; ঝটিকায় উৎপাটিতমূল, তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত উৎপলের মত শরৎ ঘুরিয়াছিল—কোথায় কোন্ হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে, শরৎ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

কোথায় পথিপার্শ্বে জীর্ণাম্বরধারী, অনাহারক্লিষ্ট বৃদ্ধ জ্যোতিহীন নয়নে অশ্রুধারা ফেলিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে; কোথায় কোন্ ভগ্নপ্রাচীর জীর্ণকুটীরে কোন্ রমণী পুরুষের দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, সন্তানগণের ভরণপোষণের উপায় না দেখিয়া, ভগ্নহৃদয়ে মরণের

পথে অগ্রসর হইতেছে; কোথায় কোন্ জনক পুত্র-শোকে হাহাকার করিতেছে, এ সকল শরতের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। জগৎ শোকময়; তদ্ভিন্ন শোকের কথা, কষ্টের কথা, আমাদের যেমন মনে থাকে, আনন্দের কথা, সুখের কথা, তেমন মনে থাকে না। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই যে সূর্য্যকিরণ অক্ষুণ্ণগৌরবে ধরণীকে শোভাময়ী করিয়াছে, সে কথা আমরা বলি না; কিন্তু কয় দিন যে বৃষ্টি হইয়া পথে বড় জল বাধিয়াছিল, বড় কর্দ্দম হইয়াছিল, সে কথা আমরা বলাবলি করি।

শরৎ ভাবিল, এই যে শোকময়, যাতনাময় জগৎ, ইহা কি কোনও দয়াময় বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে চালিত? তিনি যদি মঙ্গলময়, তবে তাঁহার রাজ্যে এত অমঙ্গল কেন? ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরবিশ্বাসী শরতের মনে এই সকল প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। প্রলোভনে পড়িয়া মানব পাপ করে, তাহার ফলে যাতনা ভোগ করে। পাপপথ পিচ্ছিল—মানব-হৃদয় দুর্ব্বল। বিধাতা মানবের পথে এত প্রলোভন স্থাপন করেন কেন? তাহাকে পাপপথে লইবার জন্য! আর সে পাপপথে গমন করিলে, তাহার অনিবার্য্য ফল,—যাতনা। তবে যদি স্বীকার করিতে হয় যে, জগৎ কোনও সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মে চালিত, তাহা হইলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মানবকে যাতনা দিয়া সুখী হয়েন। এই কি মানবের ঈশ্বর? এই ত সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তার চিত্র, যে তাঁহার

ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, পাপ হইতে দূরে অবস্থান করে, আপনার বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য সকল পালন করিতে চেষ্টা করে, তাহার পদে পদে বিপদ, পদে পদে শোক, পদে পদে যাতনা কেন? তবে সাধুতার পুরস্কার যাতনা, পুণ্যের পুরস্কার শোক, সৎপথে অবস্থানের পুরস্কার দুঃখ!

বাত্যাবিতাড়িত বারিধিবক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত দুঃখের পর দুঃখে শরৎ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এ সময় এই সকল চিন্তা স্বাভাবিক, সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা লইয়া শরৎ গৃহে ফিরিল। তখন বসন্তকাল, গাছে গাছে নব কিশলয়, পবন মধুর, প্রকৃতি হাস্যময়ী। কলিকাতায় ফিরিয়া শরৎ শুনিল যে, সেখানে বসন্ত পীড়ার ভীষণ প্রকোপ। শরৎ আরও শুনিল, বসন্তে সুবোধ বাবুর একটি কন্যার মৃত্যু হইয়াছে; শরৎ সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত। আঘাতের উপর আঘাতে সন্দেহবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সেই দিন শরৎ ডায়েরীতে লিখিল,—

"কলিকাতায় বসন্ত পীড়া হইতেছে। সুবোধ বাবুর কন্যা মালতী ঐ রোগে জগৎ হইতে অপসৃত হইয়াছে। জগতে সুখশান্তি কোথায়?

"আর লোকে বলে, জগৎ কোনও করুণাময় সর্ব্বনিয়ন্তার বিধানে চালিত! করুণাময় সর্ব্বনিয়ন্তাই বটে! পাষাণপ্রাণ সম্রাট্ও প্রজার জীবন লইয়া এমন হেলা ফেলা করে না। যাঁহার

নিকট জীবনের মূল্য নাই, জীবকে যাতনা দিয়াই যাঁহার আনন্দ তিনিই দয়াময়, করুণাময়, ক্ষমাময়, জ্ঞানময়, সকলসদ্গুণশালী!

"এ জগতে পুণ্যবান্ হাহাকার করে, পাপাচারী সুখভোগ করে,—এই জগৎ ন্যায়পরায়ণ সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মেই পরিচালিত বটে!

"আমি অনেক দিন এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, তাঁহার করুণা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতারই অধিক পরিচয় পাইয়াছি।

"শিশু প্রেত বলিলে ভয় পায়, বিকটাকার কিছু দেখিলে আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠে। বয়স্ক মানব সেরূপ করিবে কেন? কেহ কেহ এইরূপ কল্পিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারে, তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিতে পারে—সকলে ভ্রান্ত হইবে কেন?

"আমার বিশ্বাসবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।"

শরৎ আপনিও কখন ভাবিতে পারে নাই যে, সে কখনও ঈশ্বরসম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইবে। কিন্তু মানবের মনের গতির কথা কে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে?

এতদিন শরৎ কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্মতুল্য জ্ঞান করিত, এখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, কর্ত্তব্যপালনই সব। এতদিন শরৎ অস্খলিতপদে কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছে। এখনও সে সেই পথে বিচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প রহিল; কিন্তু ঈশ্বরে আর তাহার বিশ্বাস রহিল

না। সে বিশ্বাস-বন্ধন ছিন্ন করিতে শরৎ আঘাত পাইল—চিরজীবনের বিশ্বাস ছিন্ন করিতে কে না কষ্ট অনুভব করে? কিন্তু বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে শরৎ কোনও দিনই কুণ্ঠিত নহে। সেই জন্য সে বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথা।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শরৎ বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল, যোগেশ বাবুকে হারমোনিয়মের কথায় একটু বিদ্রূপও করিল। সুকুমারী ভাবিলেন; বাঁচা গেল, শরতের শোক একটু কমিয়াছে। শরতের কোন কথা, কোন ভাবই সহজে প্রকাশ পাইত না; বিশেষ শরৎ জানিত, তাহার যে দুঃখ, সে তাহার একার—সে নীরবে তাহা সহ্য করিত। লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। খনির গর্ভে মণি থাকে, কয় জন উপরে দেখিয়া তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়? শরতের জন্য সুকুমারী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই কিছু ভীতা, এখন বহু সন্তানের জননী হইয়া তাঁহার সে ভীতি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবার শরৎকে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা কতকটা দূর হইল; তাঁহার ইচ্ছা, শরৎ আবার বিবাহ করিয়া "সংসারী" হয়।

বসন্তকুমারেরও ইচ্ছা যে, শরৎ আবার বিবাহ করে। কিন্তু তিনি শরৎকে বিশেষ জানিতেন, সেই জন্য তাহাকে সে অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না। কারণ, তিনি শরৎকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং জানিতেন, শরৎ তাঁহাকে ভালবাসে। যাহাকে অধিক ভালবাসা যায়, তাহার উপর

সামান্য কারণেই রাগ হয়—আমরা আশা করি, যাহাকে এত ভালবাসি, সে অবশ্যই আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারে, সে আমায় কিছু অন্যায় বলিবে না। সে কিছু অন্যায় ব্যবহার করিলে বড় রাগ হয়; ভ্রাতায় ভ্রাতায় সহজে বিবাদ হইবার তাহাও অন্যতম কারণ। ভ্রাতাকে ভ্রাতা ভালবাসেন, সেটা রক্তের টান। বসন্তকুমার ভ্রাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং শরৎও তাঁহাকে ভালবাসে, জানিতেন; তাই বসন্তকুমার ভ্রাতাকে আবার বিবাহ করিবার অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না।

তখন যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল—সে অনুরোধের ভারটা মার উপর পড়িল। সে দিন বসন্তকুমার অগ্রেই আহার করিয়া গেলেন, তাহার পর শরৎ আহার করিতে আসিল। মা বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন, "শরৎ, বাবা তুই আবার বিয়ে কর্।" শরৎ চুপ করিয়া রহিল; মা বলিলেন, "তবে বল্ বাবা, মেয়ে দেখি?" কম্পিত কণ্ঠে শরৎ বলিল, "মা, ও কথা আমাকে বলিও না।" শরতের আর আহার হইল না। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধৌত করিয়া শরৎ আপনার ঘরে প্রবেশ করিল। পথে একটা বারান্দায় বসন্তকুমারের ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল; তাহারা দেখিল, কাকার মুখ মেঘভরা আকাশের মত অন্ধকার, আর তাঁহার ....

তাহার পর বসন্তকুমার স্থির করিলেন যে, যোগেশ বাবুকে দিয়া আর একবার শরৎকে অনুরোধ করাইতে হইবে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ডাকিয়া পাঠাইলে, শনিবার আফিস হইতে ফিরিবার পথে, যোগেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরতের মাতা জামাতার সহিত কথা কহিতেন না। দ্বারান্তরাল হইতে তিনি যাহা বলিতেছিলেন, বসন্তকুমার যোগেশ বাবুকে তাহাই বলিলেন। যোগেশ বাবু অত্যন্ত ভালমানুষের মত "আজ্ঞা হাঁ" "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া সব শুনিলেন; এবং খাবার খাইয়া গৃহে ফিরিবার সময় বসন্তকুমারকে বলিয়া গেলেন যে, শরৎকে বলা হয়, তিনি তাহাকে ডাকিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে বসন্তকুমার শরৎকে জানাইলেন যে, যোগেশ বাবু তাহাকে একবার ডাকিয়াছেন। শরৎ বলিল যে, সে পর দিবস অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তাঁহার কাছে যাইবে। যোগেশ বাবু বসন্তকুমারকেও যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যাইতে সম্মত হয়েন নাই।

পরদিবস অপরাহ্ণে, পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে, শরৎ যোগেশ বাবুর গৃহাভিমুখে চলিল। শরৎ জানিত না যে, সুবোধ বাবুর কন্যার বসন্তপীড়া হইলে, তিনি সংক্রামক রোগের স্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার জন্য, লীলা ও লতিকাকে যোগেশ বাবুর গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শরৎ

দেখিল, যোগেশ বাবুর ছেলেমেয়েদেয় সহিত লতিকা প্রাঙ্গনে খেলা করিতেছে। শরৎ আর সেখানে দাঁড়াইল না; দ্রুতপদে সে রাস্তা ছাড়াইয়া অন্য রাস্তায় গিয়া পড়িল; ঘুরিতে ঘুরিতে একটা ক্ষুদ্র উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া তরুতলস্থিত একটা উপবেশনস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শরৎ দাদাকে বলিয়াছিল যে, সে সেই দিন যোগেশ বাবুর কাছে যাইবে। কিন্তু সে যাইতে পারিল না। সে দিন সুবোধ বাবুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎ স্থির করিয়াছিল, যাহাতে লীলার সহিত তাহার শীঘ্র সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই করা তাহার কর্ত্তব্য। আজ যোগেশ বাবুর কাছে যাইলে লীলার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। লীলা বরাবরই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে; তাহার পিত্রালয়ে আসিয়া, সহসা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না চাহিলে, সুকুমারী আশ্চর্য্য হইবেন। সরলহৃদয়া সুকুমারী হয় ত তাহাকে লীলার সেখানে অবস্থানের সংবাদ দিয়া, তাহার সহিত দেখা করিতেই বলিবেন। এই সকল ভাবিয়া শরৎ যোগেশ বাবুর গৃহে লতিকাকে দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শরৎ একবার ভাবিল, যখন যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে, তখন যোগেশ বাবুর কাছে যাইবে; আবার ভাবিল, না, তদপেক্ষা গৃহে ফিরিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইবে যে, কোনও কারণবশতঃ সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে পারিল না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শরৎ গৃহে ফিরিল।

এদিকে প্রায় ছ'টার সময় বসন্তকুমার যোগেশ বাবুর গৃহে উপনীত হইয়া, যোগেশ বাবুকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ কোথায়?"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "কই সে ত এখনও আসে নাই?"

"আসে নাই!"

"না।"

বসন্তকুমার কিছু আশ্চর্য্য হইলেন; শরৎ যখন আসিবে বলিয়াছে, তাহার তখনই আসিবার কথা। যোগেশ বাবু বলিলেন, "হয় ত পথে কোন বন্ধুর সহিত দেখা হওয়ায় তিনি টানিয়া লইয়া গিয়াছেন!"

দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় একজন চাকর শরতের পত্রখানা দিয়া গেল। সেখানা পাঠ করিয়া যোগেশ বাবু মুখ হইতে আলবোলার নলটা নামাইয়া বলিলেন, "পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, তবে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট যাইবেন। চল, আমিই শরতের কাছে যাই।"

এমন সময় ছেলেকোলে সুকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুকুমারী হর্ম্ম্যতলে বসিলেন, কোলের ছেলে ঝুম্‌ঝুমি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল; তিনি বলিলেন, "কই, শরৎ আসিল না?"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "লিখিয়া পাঠাইয়াছে, আসিতে পারিবে না।"

"কেন?"

"তা আমি কেমন করিয়া বলিতে পারি বল!"

বসন্তকুমার বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যোগেশ বাবু বলিলেন, "ওগো—তোমার ভাই বিবাহ করিতেছে না, কারণ, করিলে ত আর না করা হবে না—না করিলে ইহার পর যখন ইচ্ছা করা চলিবে। শুন—কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র ছিলেন; এক জন স্মার্ত্ত, আর এক জন নৈয়ায়িক। এক দিন স্মার্ত্ত মহাশয় বাটীতে নাই, এমন সময় এক জন লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর মহাশয়, আমার একটি ছোট ছেলে মরিয়াছে, বয়স দশ বৎসর—তাহাকে পুতিতে হইবে, না পোড়াইতে হইবে?' নৈয়ায়িকের ত চক্ষুঃস্থির! পাত্রের আধাঁর তৈল কি তৈলের আধার পাত্র, এইরূপ তর্কেই জীবন গিয়াছে, ব্যবস্থার তিনি কি জানেন? অনেক ভাবনা চিন্তার পর কয় টিপ নস্য লইয়া তিনি বলিলেন, 'বাপু, পোতাই ব্যবস্থা।' স্মার্ত্ত গৃহে ফিরিলে নৈয়ায়িক বলিলেন, 'দাদা, একটা দশ বৎসরের ছেলের সৎকারের ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছিল; পুতিতে বলিয়া দিয়াছি।' স্মার্ত্ত ত চটিয়া লাল, ভ্রাতাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিলেন; বলিলেন, 'হতভাগা, অকালকুষ্মাণ্ড, ব্রাহ্ম-

ণের ঘরের ঢেঁকি, করিয়াছিস্ কি! ও যে পোড়ান ব্যবস্থা রে।' নৈয়ায়িক বলিলেন, 'কেন দাদা, অন্যায়টা কি করিয়াছি? পুঁতিতে ব্যবস্থা দিয়াছি—পোড়ান ব্যবস্থা হইলে তুলিয়া পোড়ান চলিবে; কিন্তু যদি পোড়াইতে ব্যবস্থা দিতাম, আর পোতাই ব্যবস্থা হইত, তবে পোড়ান হইলে আর ত পোতা চলিত না! আমার অন্যায়টা কি?' এখন বিবাহ যত দিন না করা যায়, ততদিন যখন ইচ্ছা করা চলে, কিন্তু একবার বিবাহ করিলে যে, আর নাটি হইবার যো নাই!"

বসন্তকুমার হাসিয়া উঠিলেন।

সুকুমারী বলিলেন, "এখন ঠাট্টা রাখ—কি করিবে?"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "করিব আর কি—এই তল্পি বাঁধিয়া তাহার বিবাহে মত করাইতে চলিলাম। যদি মত করাইতে পারি, তবে পেট ভরিয়া খাওয়াইবে ত?"

"তা খাওয়াইব, আর যদি না পার ত আফিসের সব কাগজগুলা ছিঁড়িয়া দিব; আর হারমোনিয়মটা ভাঙ্গিয়া দিব।"

গম্ভীরভাবে যোগেশ বাবু বলিলেন, "শাস্তি অতিরিক্ত কঠোর হইবে।"

তাহার পর তিনজন বসিয়া বহুক্ষণ শরতের বিবাহের কথার আন্দোলন করিলেন।

সুকুমারী বসন্তকুমারকে বলিলেন, "যা করিস ভাই,—

বিয়েতে ভাইয়ের মত করিয়ে তার বিয়ে দে। কি বয়স্ যে, সে আর বিয়ে করবে না! ও বয়সে যে অনেকে আইবুড়ই থাকে! শরৎ যেন শুকিয়ে গেছে। দেখে শুনে ভাইয়ের বিয়ে দে।"

বসন্তকুমার বলিলেন, "দিদি, আমার কি অসাধ যে, শরৎ আবার বিবাহ করে? আমারও ত, দিদি, ঐ একটি বৈ ভাই নাই। তবে শরৎকে যে বলিতেই ভয় করে।"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "তাই সে ভার আমার উপর; যা শত্রু পরে পরে।"

সুকুমারী বলিলেন, "ভারী ত কাজ করিবেন—তাই গুমোরে মাটিতে আর পা পড়ে না!"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "তবে তোমার কৃপায়, তাড়া ও গালি খাওয়ার অভ্যাসটা আমার আছে।"

হাসিতে হাসিতে যোগেশ বাবু ও বসন্তকুমার নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গৃহে যাইয়া বসন্তকুমার শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শরৎ আসিলে, যোগেশ বাবুর কাছে তাহাকে রাখিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

যোগেশ বাবু একথা ও কথা সে কথার পর বিবাহের কথাটা পাড়িলেন। শরৎ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। সাপুড়িয়া যেমন ঝাঁপির মধ্য হইতে একটা করিয়া সাপ বাহির

করে, যোগেশ বাবু তাঁহার চোকাল চোকাল যুক্তিগুলি তেমনই এক এক করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। শরৎ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল, যোগেশ বাবু ভাবিলেন, এটা সুলক্ষণ বটে। মাতার অনুরোধের পর শরৎ বুঝিয়াছিল, এখন নানা দিক্ হইতে এ অনুরোধ হইবে, রাগ করা বৃথা। কাজেই সে স্থির করিয়াছিল, সে সব সহ্য করিবে। প্রত্যেক যুক্তিটার সহিত টেবলে একটা একটা চড় মারিয়া যোগেশ বাবু বক্তৃতা শেষ করিলেন। নানা হাস্যজনক ক্ষুদ্র গল্পের বুকনি দিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, এখন বিবাহ করাটা শরতের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তাঁহার কথা শেষ হইলে শরৎ বলিল, "বৃদ্ধ বয়সে কি পাগল হইলেন? দিদিকে বলিয়া আসিব, আপনার মধ্যমনারায়ণ তৈল দরকার। দেখিবেন, যেন বাধিতে না হয়!" শরৎ একটু হাসিল, বড় কষ্টে অধরপ্রান্তে একটু হাসি আনিল। তাহার পর পূর্ণোন্মুক্ত নয়নের তীব্র দৃষ্টি যোগেশ বাবুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া শরৎ বলিল, "যোগেশবাবু, ও কথা আমাকে আর বলিবেন না।"

উঠিয়া শরৎ নিজ কক্ষে চলিয়া গেল, সেখানে যাইয়া প্রভার কথা ভাবিতে লাগিল। আজ তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সংসারে তাহার আর আকর্ষণ নাই, যেন জগতে সে নিতান্ত একাকী।

বিপত্নীক।

যে সকল প্রাণপ্রিয় স্বজনগণকে এ জগতে আর দেখিতে পাইব না, তাঁহাদিগের কথা ভাবিলে সংসার মরুতুল্যই অনুমিত হয়—বোধ হয় জগত যেন শূন্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

আবার অভাগিনী।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। যে জন্য শরৎ যাইবে বলিয়াও যোগেশ বাবুর কাছে যায় নাই, তাহাই হইল। লীলা তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার সকল কথা শুনিতে পাইল। পিত্রালয়ে আসিয়া লীলার বড় কিছু কাজ ছিল না। লতিকা মামার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, কেবল বড় শ্রান্ত হইলে মার কাছে আসিয়া বসিত। সংসারের কাজে সুকুমারী তাহাকে হাত দিতে দিতেন না—পাছে তাহার পরিশ্রম হয়। ছেলে-কোলে সুকুমারী সংসারের সব কাজ করিতেন, এবং একটু অবসর পাইলেই যাইয়া যোগেশ বাবুর সহিত ঝগড়া করিতেন। লীলার এদিকে কোন কাজই ছিল না, কিন্তু চিন্তার অভাব ছিল না।

যে কক্ষে বসন্তকুমার যোগেশ বাবুর সহিত শরতের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বের কক্ষেই তখন লীলা ছিল। সুকুমারী, বসন্তকুমার ও যোগেশ বাবু শরতের বিবাহের বিষয়টা লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, পার্শ্বের কক্ষ হইতে লীলা তাঁহাদের সব কথা শুনিতেছিল। যখন হাতে কোন কাজ না থাকে, এবং বহুক্ষণ কিছু ভাবিয়া

ভাবিয়া ভাবিতেও আর ইচ্ছা করে না, তখন কার্য্যহীন ক্লান্ত মনোযোগ একটা কোন কার্য্যে আপনাকে প্রয়োগ করিবার অবসর অন্বেষণ করে, এবং প্রথম প্রাপ্ত কার্য্যেই নিযুক্ত হয়। তাই লীলা পার্শ্বের কক্ষের কথোপকথন শুনিতে প্রবৃত্তা হইয়াছি ল।

লীলা এক এক করিয়া সব কথা শুনিল। লীলার কণ্ঠ-মধ্যে একটা যাতনাব্যঞ্জক ধ্বনি উঠিতেছিল; কষ্টে লীলা তাহা নিবারিত করিল।

লীলা সব কথা শুনিল। না কাঁদিলে মনের যাতনার লাঘব হয় না। দুঃখ যাতনা তীব্রতম হইলে ক্রন্দন আইসে না বলিয়াই যাতনা অত অধিক হয়। এই দুঃখদুর্দ্দশাময় জগতে যে ক্রন্দন করে না, সে সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে। বড় গুমটের পর যদি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, তবে আকাশে আবার সূর্য্যকর হাসিল, তরুলতা স্নিগ্ধ হইল, ধরণীর তাপিত তৃষ্ণা নিবারিত হইল। আর যদি বৃষ্টি না হইল, তবে একটা প্রবল ঝড়ে বড় ভীষণ ফলের আশঙ্কা রহিল। বৃষ্টিপাত হইলে আকাশেরও ভার কমে, ধরণীও শীতল হয়। বড় কষ্টের সময় কাঁদিতে পারিলে মনেরও ভার কমে—যাতনার বেগও প্রশমিত হয়। লীলা কেবল কাঁদিবার অবসর খুঁজিতেছিল।

যোগেশ বাবু ও বসন্তকুমার চলিয়া গেলে সুকুমারী লীলার কাছে আসিলেন। লীলা দেখিল, বড় বিপদ। তাহার

মুখ অন্ধকার দেখিয়া সুকুমারী বলিলেন, "লীলা, অসুখ করিয়াছে নাকি?"

লীলা একটা সুবিধা পাইল—বলিল, "মাথাটা বড় ধরিয়াছে।"

ব্যস্তভাবে সুকুমারী বলিলেন, "মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দিব?"

ম্লানভাবে লীলা বলিল, "এ শরীরে আর যত্ন কেন, বৌদিদি?"

সুকুমারী বড় ব্যথিতা হইলেন। লীলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তখন সে বলিল, "আমি একটু শুই, এখনই সারিয়া যাইবে।"

সুকুমারী বাহিরে আসিয়া ভাসা চক্ষে জল মুছিলেন।

লীলা কিছুক্ষণ কাঁদিল; তাহার পর ভাবিতে লাগিল। লীলার অন্ধকার হৃদয়ে প্রেমারুণোদয় সূচিত হইতেছিল। আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে। জীবন যত সুখের বল, তত সুখেরও নহে—যত দুঃখের বল, তত দুঃখেরও নহে। রঙ্গিন চশমার মধ্য দিয়া দেখিলে সবই রঙ্গিন বোধ হয়—হৃদয়ের অবস্থানুসারেও সেইরূপ জগৎ সুখময় বা দুঃখময় দেখিতে পাই। সুখের সময় সবই যেন সুখময় বোধ হয়—প্রকৃতি যেন হাসিতে থাকে, বিহগ যেন আনন্দের গীত গাহিতে থাকে, লতাপাদপকুল যেন আনন্দে হিল্লোলিত হইতে থাকে; আবার, দুঃখের সময় সেই সকলই দুঃখময় বলিয়া অনুমিত

হয়—প্রকৃতি যেন বিষাদভারাবনতা বলিয়া বোধ হয়, বিহগ-কাকলি যেন বেদনাব্যঞ্জক গীত বলিয়া বোধ হয়, লতাপাদপ-কুল যেন কেবল দুঃখে মর্ম্মররব তুলে। কেবল আশাই একরূপ থাকে—সুখের সময়ও আশা থাকে, দুঃখের সময়ও আশা থাকে। আশা না থাকিলে, এ জীবনের ভার বহিয়া উঠাই দায় হইয়া উঠিত।

লীলার হৃদয়েও আশা ছিল বলিয়াই, তাহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে, বুঝি তাহারও অজ্ঞাতে, প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছিল। আর সেই আশা ছিল বলিয়াই, সে শরতের বিবাহের কথা শুনিয়া ব্যথিতা হইয়াছিল।

আজ লীলা আশৈশব সকল কথা, ভাবিতে লাগিল। জীবনের ঘটনাবলি সে আজ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল—তাহার অতীত জীবন একটা স্বপ্ন। যেন তাহার জীবন আরব্য উপন্যাসের বিচিত্রঘটনা-সঙ্কুল একাধিকসহস্ররজনীর মধ্য হইতে বিচ্যুত একটি মাত্র রজনী—স্বপ্নলোক হইতে না জানি কখন আসিয়া কঠোর সত্যময় জগতে পড়িয়াছে। জীবনের আদিই বা কোথায়, অন্তই বা কোথায়? জীবন স্বপ্নমাত্র। সেই শৈশবের চাঞ্চল্য—চিন্তাভারহীন সরল হৃদয়! তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার চিত্রপট আলো করিয়া শরতের মূর্ত্তি কেবল ফুটিতে আরম্ভ করিতেছিল—যেন গিরিগহ্বরের যুগব্যাপী

বিপত্নীক।

অন্ধকার মধ্যে তপনকিরণ প্রবেশ করিতেছিল—সেই সময় সব গোলমাল হইয়া গেল। বসন্তপবনস্পর্শে যেমন একদিনে লতিকার অঙ্গে নবকিশলয়শোভা প্রকাশিত হয়, তেমনই বিবাহবন্ধনে সেই চিত্রপটে উজ্জ্বলতম বর্ণে প্রবোধের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল—শরতের মূর্ত্তি অকালজলদোদয়ে অরুণরাগের মত ম্লান হইয়া গেল। প্রবোধের প্রেমস্রোতে অতীতের চিন্তা ভাসিয়া গেল—কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে প্রস্ফুটোন্মুখী বাসনা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তাহার পর আবার পত্নীত্ব আসিয়া জননীত্বে বিকশিত হইল—লীলার হৃদয়ের নিভৃতনিকুঞ্জনিকেতনে কোকিলের স্বর শ্রুত হইল, বিকচকুসুমশোভা প্রকাশ পাইল। শিশুর প্রথম কণ্ঠস্বরের সহিত জননীর হৃদয়ে কত আশা, কত আনন্দই বিকশিত হইল! সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া লীলা ভাবিল, জগতে স্বর্গসুখ ত ইহাই! তাই বলিয়াছি—সব গোলমাল হইয়া গেল।

তাহার পর আবার ধরণীর উপর হইতে দিবালোকের মত প্রেম, আশা, আনন্দ, সকলের মূল প্রবোধ চলিয়া গেল—মধ্যাহ্নে রজনী আসিল—জ্বলিতে জ্বলিতে সহসা দীপ নিবিল। স্রোতোমুখে বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত লীলার সুখাশা ভাসিয়া গেল। আবার সব গোলমাল হইয়া গেল।

তাহার পর অন্ধকার হৃদয়ে আবার আলোক ফুটিতেছে;

মাত্র। আবার আঁধার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া শরতের বিলুপ্ত প্রায় মূর্ত্তি ফুটিতেছে। বর্ষার আকাশে তপনের মত, তাহার হৃদয়ে শরতের মূর্ত্তি ফুটিতেছে—আবার নবীন আশা বর্ষা-বারিপাতে প্রান্তরবক্ষে তৃণরাজির মত দেখা দিতেছে। আবার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে—সবই গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

সে কখনও প্রবোধের নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হয় নাই। সে প্রবোধের জীবন আকুল আনন্দময়, সীমাহীন সুখময়, তলতীরহীন তৃপ্তিময়—আর সকল আনন্দ, সকল সুখ, সকল তৃপ্তির সার—প্রেমময় করিয়াছিল। সে প্রবোধকে সুখী করিয়াছিল। হয় ত কালে সে শরৎকে ভুলিতে পারিত; কিন্তু ঘটনাস্রোতঃ তাহাকে অন্যদিকে লইয়া গেল। প্রবোধ চলিয়া গেল; আবার তপনতাপে ক্ষুদ্র কুসুমের মত প্রতাপও শুকাইয়া গেল। সব গোলমাল হইয়া গেল।

এ যেন একটা ষড়যন্ত্র, এ যেন একটা কৌশল, এ যেন একটা বিস্তৃত জটিল জাল। নদীর তরঙ্গের মত, ঘটনার পর ঘটনা, তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে—সব গোলমাল করিয়া দিতেছে! মানবজীবন স্বপ্ন ভিন্ন আর কি? জীবন একটা স্বপ্ন—একটা প্রহেলিকা।

লীলা এমনই কত কি ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার কি ছাই অন্ত আছে যে, সে ভাবিয়া কূল পাইবে? যাহা হউক,

লীলার হৃদয়ে শরৎলাভবাসনা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। লীলা ভাবিল যে, ঘটনাস্রোতঃ তাহাকে কেবল তাহার নিয়তির দিকে লইয়া যাইতেছে। লীলা বারবার শরতের সেই শেষ কথা চিন্তা করিতে লাগিল—সেদিন উচ্ছ্বসিতভাবে শরৎ সুবোধ বাবুর পত্নীকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সেই সকল কথা ভাবিল। যদি কেহ সেখানে থাকিত, তবে দেখিতে পাইত, তখন লীলার রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরে মৃদুহাস্য খেলা করিয়াছিল, লীলার ভরা গণ্ডে গোলাপ ফুটিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। লীলা কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া যে কিছু স্থির করিল, তাহা নহে; তবে সে এইটুকু বুঝিল যে, শরৎকে না পাইলে তাহার জীবন মরুতুল্য হইবে।

লীলা উঠিল। এমন সময় লতিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা তাহাকে কোলে লইয়া অসীম আবেগে তাহার মুখচুম্বন করিল। সেই তাহার জীবন মরুভূমিতে সদাবাহিত স্বচ্ছ সলিলের প্রস্রবণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আগুন জ্বলিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরে, একদিন অপরাহ্নে সুকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন—লীলাও তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। লীলা ইচ্ছা করিয়াই আসিয়াছিল।

সুকুমারী শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, শরৎ হাসিমুখে দিদির সহিত পূর্ব্বের মতই আলাপ করিল; তাঁহার কোলের ছেলেটিকে আদর করিল। সুকুমারী লক্ষ্য করিতে পারিলেন না যে, শরতের ঝঙ্কারী কণ্ঠস্বরে একটু বিষাদের ভাব আসিয়াছে।

শরতের ঘর হইতে আসিয়া সুকুমারী লীলাকে বলিলেন, "যাও, তোমার দেবরের সঙ্গে দেখা করিয়া আইস।"—মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কটাই ধরিয়া থাকেন। লীলা শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

যে ঘরে শরৎ থাকিত, সে ঘর ও অন্য ঘরগুলির মধ্যে একটা ছাদ ব্যবধান—সে দিকে আর ঘর নাই। সেই নিরিবিলি ঘরে শরৎ থাকিত; বন্ধুবান্ধবগণ আসিলে, নিম্ন-তলে বসিবার ঘরে যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত। কক্ষে একটা টেবিলের উপর লিখিবার সব উপকরণ, খানকতক পুস্তক, কতকগুলা কাগজ, একখানা আয়না—উপন্যাস

বিপত্নীক।

লিখিতে হইলে, মুখভাব লক্ষ্য করিতে এথানা আবশ্যক হয়—একখানা চেয়ার, একটা হোয়াট্‌নটে কতকগুলা পুস্তক; একখানা বড় কোচ—তাহাতে শরৎ শয়ন করে; কক্ষ-প্রাচীরে কেবল একখানা ছবি—প্রভার একখানা বৃহৎ তৈল-চিত্র। সহসা লীলাকে কক্ষমধ্যে দেখিয়া শরৎ কিছু চমকিত হইল; সে তখন বাতায়নপথে আকাশে মেঘসমাগম দেখিতেছিল। লীলা আসিলে, শরৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লীলা বলিল, "কেমন আছেন?"

শরৎ বলিল, "মন্দ নহে।"

লীলা একটু ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু আজ সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল—বলিল, "আপনি আর বিবাহ করিবেন না কেন?"

স্থিরস্বরে শরৎ বলিল, "ইচ্ছা নাই।"

লীলা বলিল, "সকলেরই ইচ্ছা, আপনি আবার বিবাহ করেন। অমন বয়সে সবাই ত করে।"

"একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে কেন কষ্ট দিব?"

"বালিকা কেন?"

"কেন?"

লীলা আজ শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিল। সে বলিল, "কেন বিধবাবিবাহে ত আপনার আপত্তি নাই। অনেকে বিধবাবিবাহ করিতে পারে।"

আকাশে মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ; সেই রেখায় রেখায় রবিকর ফুটিয়া বাহির-হইতে চাহিতেছিল। বাতাস স্তব্ধ হইয়া ছিল। সহসা বৃক্ষরাজির স্বর্ণবর্ণ শুষ্ক পত্রজাল উড়াইয়া একটা বাতাস উঠিয়া তরুলতার মৃদুমর্ম্মর, সম্মোহন সঙ্গীত এবং আর্ত্তচীৎকার মিশাইয়া দিল। মেঘ যেন এই সঙ্কেতেরই অপেক্ষা করিতেছিল। বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। হুহু করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল—ঝর ঝর করিয়া বারিপাত হইতে লাগিল।

লীলা আপনার কথা বলিল না। কোন্ রমণী এরূপ স্থলে স্পষ্ট করিয়া আপনার কথা কহিতে পারেন? এই লজ্জাই রমণীর কোমলতা, এই লজ্জাই রমণীর ভূষণ, এই লজ্জাই রমণীর বিশেষত্ব। লীলা আপনার কথা বলিল না বটে, কিন্তু শরৎ তাহা বুঝিতে পারিল। লীলার নিকট শরৎ এ সকল কথা প্রত্যাশা করিতে পারে নাই—স্থির ভাবে শরৎ বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

লীলা এক পদ অগ্রসর হইল; আলুলায়িত কুন্তলজাল সহ মস্তক পশ্চাতে হেলাইয়া, আপনার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্য হইতে লীলা বলিল, "কেন, বিধানদাতা কি দৃষ্টান্ত দেখাইতে কুণ্ঠিত?" লীলা যেন একটু ঘৃণার হাসি হাসিল। লীলা কেবল পড়া পাখীর মত এ সকল বলিতেছিল। সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল—সে আজ শেষবার চেষ্টা করিতে আসিয়াছিল; হয় শরৎ লাভ—নহে ত চিরদিন যাতনা।

বিপত্নীক।

লীলার কথা শুনিয়া শরৎ দুঃখিত, ব্যথিত ও লজ্জিত হইল। স্থিরস্বরে ধীরে ধীরে শরৎ বলিল, "লীলা, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ একাধিক। প্রবোধকে আমি ভ্রাতার মতই দেখিয়াছি—কখনও পর ভাবি নাই। প্রবোধ আমার প্রাণ-প্রিয় বন্ধু ছিল—তুমি তাহারই পত্নী। তোমার ইষ্টানিষ্ট, মঙ্গলামঙ্গল দেখা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। প্রবোধের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের জন্য সেই টুকু না করিলে, আমার অন্যায় করা হইবে। আমার বিবাহে প্রবৃত্তি নাই—তাই আমি বিবাহ করিব না। কিন্তু, লীলা, সংসারের পিচ্ছিলপথে বড় সতর্ক হইয়া চলিও। সংযম শিক্ষা কর, মনোবৃত্তির উত্তেজনায় স্রোতোমুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাইও না।"

শরৎ নীরব হইল। বাহিরে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল, বাতাস চীৎকার করিতে লাগিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

লীলা এত দিন ধরিয়া এই দিনের জন্যই প্রস্তুত হইতেছিল; তবু সে বুঝিতে পারিল যে, শরতের দৃঢ়তার সম্মুখে তাহার হৃদয়ের বল অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু লীলা মনে করিল যে, সে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সহসা ফিরিবারও আর পথ নাই। শরৎ-লাভের আশার উত্তেজনায় সে এত দিন যাহা ভাবে নাই, এখন তাহা বুঝিল—বুঝিল যে, আজ হতাশ হইয়া ফিরিলে লজ্জা ও ঘৃণার তীব্রতম দংশন

এ জীবনে আর নিবারিত হইবে না। অন্তরের অন্তরতর প্রদেশে তাহাকে সারা জীবন সে দংশনযাতনা সহ্য করিতে হইবে। লীলা রমণীসুলভ লজ্জার প্রভাব অনুভব করিতেছিল, কিন্তু বহু কষ্টে সে হৃদয় দৃঢ় করিল।

লীলা বলিল, "দোষ কাহার? শৈশব হইতে কেন আমি জানিয়াছিলাম যে, তুমিই আমার পতি হইবে? যে বয়সে কোনও চিন্তা, কোনও ভাব সহজেই হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, সে বয়সে আমি যে তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিরূপে কল্পনা করিতে পারি নাই! তখন আমি ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র গড়িয়াছি, তাহা হইতে তোমাকে বাদ দিতে পারি নাই! তাহার পর তুমি আমাকে বিবাহ করিলে না, বারংবার আমাকে দেখা দিলে কেন? মুঙ্গেরে কেন আমি তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম, 'প্রণয়ে পাপ, নাই'? তোমার কথা আমি বেদবাক্যতুল্য জ্ঞান করিতাম—তাই তোমার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তাহার পর, তুমি চলিয়া গেলে—আমি বাঁচিলাম। আবার কেন তুমি আমাকে দেখা দিলে? কেন তুমি এ মুগ্ধা বিধবার সম্মুখে সে দিন অত কথা কহিলে—কেন আমার হৃদয়ে নির্ব্বাপিতপ্রায় বহ্নি পুনঃপ্রজ্বালিত করিলে? দোষ কাহার?"

লীলা আর পারিল না—তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল—পল্লবপর্ণে জল টলটল করিতে লাগিল। বাহিরে হুহু

করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; আর অভাগিনী লীলার হৃদয়ে তদপেক্ষাও প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

দৃঢ়স্বরে ধীরে ধীরে শরৎ বলিল, "তুমি আমার কথা বুঝ নাই—না বুঝিয়াই এইরূপ ভাবিয়াছ। হয় ত তুমি আমার সব কথাও শুন নাই। তুমি প্রবোধের পত্নী—তাই আরও একবার তোমাকে বলিতেছি, মনোবৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা কর।"

অশ্রু মুছিয়া লীলা বলিল, "আমি কোন দিন তাঁহার নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হই নাই। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমার প্রণয়ের কথা কেহ জানিতেও পারিত না। আমি ত মনোবৃত্তি দমন করিয়াছিলাম—বাসনা অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। তুমি কেন সে দিন বিধবার বিবাহের কথা তুলিয়া অত কথা বলিলে?"

"সে দিন যাহা বলিয়াছি, আজও তাহাই বলিতে পারি। তবে তোমার সমক্ষে অত কথা বলিয়া হয় ত ভাল করি নাই। তোমাকে দেখা দিব না বলিয়াই আমি পশ্চিমে গিয়াছিলাম—অর্থোপার্জ্জনের জন্য আমি পশ্চিমে যাই নাই। তাহার পর যখন শুনিলাম যে, প্রবোধ মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন আর থাকিতে না পারিয়া আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এত দিনে তুমি সব ভুলিতে পারিয়াছ।

"ভুলিবার হইলে ভুলিতে পারিতাম। রমণীর প্রেম পুরু-

মের প্রেমের মত সামান্য নহে। আমি যদি তোমাকে হারাই, তবে পুণ্যপথে আমার সকল আকর্ষণ ও পাপপথে আমার সকল বাধা দূর হয়। সে অবস্থায় জীবন-ধারণ অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ।" (প্রণয় প্রথম প্রবল হইলে পুরুষ ও রমণী পরস্পরের কাছাকাছি হইতে চাহে—তাই তখন রমণীর সাহস কিছু অধিক হয়, পুরুষের লজ্জা কিছু অধিক হয়।)

"যাহাই কর, বিবেচনা করিয়া করিও। তোমার দুহিতার কথা ভাবিও। তোমার আপনার কথা ভিন্ন, আর কাহারও কথা ভাবিবার আছে; সন্তানের প্রতি জননীর কর্ত্তব্য আছে। লতিকার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কার্য্য করিও।"

ধীরে ধীরে অতি দৃঢ়স্বরে শরৎ এই কথাগুলি বলিল। লীলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল। যে অপত্যস্নেহ লীলার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল, শরতের কথা সেই অপত্যস্নেহে আঘাত করিল—তাই লীলা বড় বেদনা অনুভব করিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লীলা কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তেমনই ঝড় বহিতে লাগিল, তেমনই বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দুই জনের কেহই কথা কহিল না। লীলা কাঁদিতে লাগিল, শরৎও চক্ষের জল মুছিল।

অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টি একটু ধরিল। তখন লীলা চলিয়া গেল।

লীলা চলিয়া গেলে, প্রভার চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শরৎ

বিপত্নীক।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চিত্রখানার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর আসিয়া কৌচের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

শরতের হৃদয়ের হৃদয় হইতে ব্যথিত বাসনা উঠিল, আজ যদি প্রভা বাঁচিয়া থাকিত!

চতুর্থ খণ্ড

সন্ধ্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

শরৎ কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। যোগেশ বাবু বলিলেন, "কবিদের রকমই ঐ; তাহারা বড় অল্পে ব্যথিত হয়, যেন লজ্জাবতী লতা! আর শরৎও কবিতা লেখে। সে বলিবে, আমাদের রকমই ঐ। জান না, একদিন একটা পুষ্করিণীতে বড় হৈচৈ পড়িয়া গেল, পুষ্করিণীর কাছ দিয়া একটা হাতী যাইতেছে; সংবাদদাতা স্বয়ং কর্কট বাহাদুর; তিনি পাহাড়ের উপর বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিলেন, আসিয়া সংবাদ দিলেন। তখন সকলেই হাতী দেখিতে গেল। হস্তী চলিয়া গেল; তখন মৎস্যকুল তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। শেষকালে পণ্ডিতপ্রবর চিংড়ি হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, 'যাহাই বল বাপু সকল, ওটা বড়ই টলিতে টলিতে টলিতে টলিতে মাতালের মত চলিয়া গেল।' পার্শ্বেই ভেক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে উভচর বলিয়া সকলেই ঘৃণা করিত; সে দেখিল, এই একটা সুযোগ। সে সট্ করিয়া বলিল, 'আমাদের, চারপেয়েদের চলনই ঐ রকম।' শরৎও সেইরূপ বলিবে, 'আমাদের কবিদের রকমই ঐ।'"

আজ কিন্তু এ কথাটা সুকুমারীর ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "ভারি ত ক্ষমতা! এবার সবই বুঝা গিয়াছে। মুখখানা আছে, কাজের বেলা কিছুই নহে।"

যোগেশ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিলে যদি হইত, তবে আমি একটা কেন, পাঁচটা বিবাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে ত চলিবে না; সে হইলে কাজটা খুবই সোজা হইয়া যাইত।"

"কথায় ত আর কেহ পরিবে না! কেবল বাক্য সার। কেবল পোড়ানে পোড়ানে বচনগুলি আছে!"

"আচ্ছা, আমি বিবাহ করিলে হয় কি না, জানিবার জন্য আমি আজই শরৎকে পত্র লিখিতেছি।"

ছেলেটিকে লইয়া সুকুমারী উঠিয়া গেলেন। রণপরাজিত যোগেশ বাবু স্তিমিতলোচনে ফুরসীর সহিত পরিচয় আরম্ভ করিলেন।

শরৎ বিবাহ করিল না, তাই "সন্ন্যাসী" হইয়া রহিল বলিয়া সুকুমারী বড় দুঃখিতা হইলেন।

বসন্তকুমার আর শরৎকে বিবাহের অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না। শরতের জননী তাহাকে আরও এক-দিন সে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সে দিন শরৎ বলিল, "মা, তোমরা যদি বার বার ঐ কথা বল, তবে আমি পশ্চিমে যেখানে ছিলাম, সেখানে চলিয়া যাইব। জীবনে আর কখনও

ফিরিয়া আসিব না।" সেই হইতে মাও আর সে কথা পাড়িতে সাহস করেন নাই। সুতরাং শরৎ সে দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। শরৎ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

শরৎ প্রভাকে বলিয়াছিল যে, প্রভাকে হারাইলে তাহাদিগের বিবাহিতজীবনের সুখের স্মৃতিই কেবল তাহার সুখ হইবে। এখন শরৎ দেখিল যে, দুঃখের সময় বিগত সুখের কথা ভাবিলে দুঃখ দ্বিগুণ হয় মাত্র। তাহাতে সুখ নাই। প্রভাময় জগতে বাস এক কথা, আর অন্য সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল অতীতজীবনের কথা চিন্তা করা এক কথা। শরৎ একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে, স্থির করিল।

শরৎ দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত সাহিত্যসেবায় ব্যাপৃত হইল। শরতের মত বহু-গ্রন্থ-পাঠক সচরাচর দেখা যায় না। এখন শরৎ অন্যান্য ভাষার শিক্ষায় মনোযোগ দিল, এবং রচনায় অধিক অবহিত হইল। শরৎ অর্থ বা যশের জন্য লিখিত না, সে আপনার তৃপ্তির জন্য লিখিত।

ভাইপো, ভাইঝিদের লইয়া, সাহিত্যসেবা করিয়া, প্রভার কথা ভাবিয়া, শরতের দিন কাটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মরণের ছায়া।

নদীর স্রোতের মুখে যদি কোন বাধা পড়ে, তবে নদী প্রথমে সেই বাধা দূর করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। যদি তাহা দূর করিতে না পারে, তবে নদী অন্য পথে গমন করিবে। শরৎ একবার নদীর সহিত মানবের মনের তুলনা করিয়াছে, আমিও তাহার পতানুগতি করিতে বাধ্য হইতেছি। মানব-হৃদয় নদীর সহিত উপমেয়। হৃদয় যে দিকে যাইতে চাহে, সে দিকে তাহার গমনপথে কোনও বাধা থাকিলে প্রথমে বাধা-দূরীকরণেই তাহার চেষ্টা হয়; অকৃতকার্য্য হইলে হৃদয় বাসনার তরঙ্গরাশিকে অন্য পথে লইয়া যায়। হতাশ হইয়া লীলা গৃহে ফিরিয়া বড় কাঁদিল। তাহার পর দিবস সে জিদ করিয়া পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় চলিয়া গেল। প্রবোধের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ও জননী তীর্থভ্রমণে যাইতেছিলেন; লীলা তাঁহাদিগের সহিত যাইতে চাহিল। প্রবোধের মাতার ইচ্ছা ছিল না যে, কষ্টসাধ্য তীর্থভ্রমণে লীলা তাঁহার সহচারিণী হয়। যে শাশুড়ী পুত্রবধূকে সত্যই কন্যার মত দেখেন, তিনি কি বিধবা পুত্রবধূকে এই অল্প বয়সে কষ্টকর তীর্থভ্রমণে সঙ্গিনী করিতে চাহেন? তাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়। সুবোধচন্দ্রেরও ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা তীর্থভ্রমণে গমন

করে। লীলা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে ধরিল। তিনি পোড়া মুখ আরও পোড়াইয়া বলিলেন যে, একালের মেয়েদের ত ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই গিয়াছে, তবে যদি বা কপাল গুণে (এবং তাঁহার মত পবিত্রচিত্তা, শুচিবেয়ে শাশুড়ীর আদর্শে) বধূমাতার মতিগতি নারায়ণের ইচ্ছায় ফিরিয়া থাকে, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অগত্যা সুবোধচন্দ্র মত দিলেন। তখন কথা হইল, লতিকাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে কি না। লীলা লতিকাকে রাখিয়া যাইতে চাহিল; বলিল, "মেয়ে, ছুদিন পরে ত পরের ঘরে যাইবেই, তবে অত মায়া করিয়া কি করিব?" কিন্তু লতিকা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুই নাকি আমায় রেখে কোথায় যাবি?" তখন লীলা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। লতিকাকে সুবোধ বাবুর পত্নীর কাছে রাখিয়া যাওয়াই স্থির হইল। কেহই বুঝিল না, স্নেহময়ী লীলা কেন লতিকাকে রাখিয়াও বিদেশে যাইতে চাহিল। লীলা তীর্থদর্শনে যাইবে শুনিয়া, যোগেশ বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন; কিন্তু লীলা দাদার কথা আমলে আনিল না।

লীলা তীর্থদর্শনে বাহির হইল। আজিও আপদে, বিপদে শোকে, দুঃখে, যাতনায়, মর্ম্মব্যথায়, অধিকাংশ লোক যাহা করে, লীলা তাহাই করিল; লীলা জগদতীত কোথাও হইতে বল প্রার্থনা করিল। শোকে, দুঃখে, লোক একটা অবলম্বন

চাহে; পাদপ আপনার উন্নত মহিমায় ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত অবহেলা করিয়া উন্নত হয়, কিন্তু দুর্ব্বল লতিকা একটা অবলম্বন নহিলে পারে না। অনেক মানব-হৃদয় এই অবলম্বন-স্বরূপেই ঈশ্বরকে অবলম্বন করে। লীলা তাহাই করিল। লীলা তীর্থে তীর্থে ঘুরিল; সাধুগণের ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল; ভাবিল, ইঁহারা একে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছেন; যাহা একের সাধ্য, তাহা কি অপরের একেবারেই অসাধ্য? দেব-প্রতিমার সম্মুখে প্রণতা হইয়া মুদিতনেত্রে লীলা প্রার্থনা করিল, "তুমি সাকার হও, বা নিরাকার হও, হে মহাশক্তি, এই দুর্ব্বলকে বল দাও, শক্তিহীনাকে শক্তি দাও।" শাশুড়ীর মুখে সীতাসাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সে মুগ্ধ হইল।

প্রয়াগক্ষেত্রে লীলা ইচ্ছা করিয়া মাথা মুড়াইল। শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন—;লীলা শুনিল না।

বিধবার বেশে বিধবা লীলা গৃহে ফিরিয়া আসিল, আসিয়া স্বামীর পাদুকা লইয়া সাবিত্রীব্রত করিল। লীলা এখন যে সকল কষ্টসাধ্য ব্রতাদি পালন করিতে চাহিত, প্রবোধের জ্যেষ্ঠতাতপত্নীকে তাহা জানাইত। বধূমাতার সুমতি হইয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাকে তাহা পালন করিতে দিতে হইবেই জিদ করিতেন; প্রবোধের জননী দিদির কথা টালিতে পারিতেন না।

লীলা হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। লীলা যত

আবেগে আরম্ভ করিয়াছিল ; সে আপনার বলের প্রতি লক্ষ্য করে নাই, এক বার আপনার কথা ভাবেও নাই। তাহার কর্ণে কেবল সেই কথা ধ্বনিত হইতেছিল—"তুমি প্রবোধের পত্নী—তাই আরও এক বার তোমাকে বলিতেছি, মনোবৃত্তি-দমন করিতে শিক্ষা কর।" শরতের সেই কথা লীলার পক্ষে অন্ধকারে আলোকের মত বোধ হইয়াছিল। লীলা মনোবৃত্তিদমনের চেষ্টাই করিতেছিল ; সে সর্ব্বদাই মনে করিত—সে প্রবোধের পত্নী। লীলা ভাবিত, সে প্রবোধের পত্নী। লীলার মুখে বিষাদের ছায়া। লীলা বিধবার আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিল, আপনার কঠোর বৈধব্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপিত করিয়া সে বহির্জগতের দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়াও চাহিল না। বায়ুবিক্ষেপবিক্ষুব্ধ বারিরাশির মত লীলার হৃদয় চিন্তায় উদ্বেল হইতেছিল।

লীলা শুকাইতে লাগিল। আর সে লাবণ্য নাই, সে রূপ নাই, সে উজ্জ্বল বর্ণ এখন মলিন হইয়াছে। নয়নে আর সে চাহনি নাই ; বদনে আর সে শ্রী নাই ; শীর্ণগণ্ডে আর সে গোলাপি আভা নাই। সুবোধচন্দ্রের পত্নী কয় দিন বলিলেন, "বোন্, শরীর যে মাটি করিতে বসিলি ! এমন করিলে শরীর কয় দিন টিকিবে ? লতিকার মুখ চাহিয়া শরীরে একটু যত্ন কর্। যাহা হইয়াছে, তাহা বলিয়া আর কি করিবি ? অদৃষ্টের বাহিরে কি পথ আছে, বোন্ ?"

বিপত্নীক।

লীলা ম্লান হাসি হাসিল।

কীটদষ্ট কুসুমের মত লীলা দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল; কেবল লীলা যতই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, তাহার অপত্যস্নেহ যেন ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুঃখে কষ্টে লোক সন্তানকে দ্বিগুণ স্নেহ করিতে থাকে।

এমনই করিয়া ছয় মাস গেল;—লীলা দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার শরীর ভাল ছিল না, ষষ্ঠ মাসের শেষে সামান্য জ্বর ও কাশি দেখা দিল। লীলা বুঝিল, তাহার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই। লীলা আনন্দিতা হইল; বাত্যাবেগে ভগ্নপোত নাবিক মেঘের মত আঁধার জলরাশির উপর দূরে ক্ষুদ্র বিহগের মত অন্য পোত দেখিলে উদ্ধারের আশায় যেমন আনন্দিত হয়, মরণের আশায় লীলা তেমনই আনন্দিতা হইল। তাহার যাহা কিছু কষ্ট, কেবল লতিকাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া;—ক্রমে ক্রমে লীলা সে চিন্তাও সহ্য করিতে শিখিল।

আট মাস চলিয়া গেল। লীলা রীতিমত গৃহকর্ম্ম করিত, পীড়ার কথা বলিলে সে কথায় কান দিত না; সে অসুখের কথা কাহাকেও বলে নাই। কিন্তু কাশিটা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। সুবোধ বাবুর পত্নী পতিকে লীলার কথা বলিলেন। চিকিৎসার কথা হইলে লীলা বলিত, "আমার হইয়াছে কি যে, আমি ঔষধ খাইব?" পীড়াপীড়িতে লীলা ঔষধ খাইতে সম্মত

হইল; কিন্তু কিছুতেই ডাক্তারের ঔষধ খাইতে সম্মত হইল না। অগত্যা কবিরাজ ডাকান হইল। ইহার একটু কারণ ছিল; কবিরাজের ঔষধের উপকারিতায় প্রবোধের আদৌ বিশ্বাস ছিল না, তাই লীলাও ভাবিয়াছিল যে, ছাইভস্ম খাইলে কোনও উপকার হইবে না। সেই জন্যই সে কবিরাজের ঔষধ খাইতে সম্মতা হইয়াছিল। কিন্তু কয় দিন ঔষধ সেবন করিয়া লীলা বুঝিল, ঔষধে উপকার দর্শিতেছে। তখন লীলা ঔষধ ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিল। পানের রস, মধু, ঔষধের বড়ি, সব রাস্তায় পড়িতে লাগিল। পীড়াও বাড়িতে লাগিল।

এমনই করিয়া আরও দুই মাস গেল। একাদশমাসে লীলার অসুখ অত্যন্ত বাড়িল; লীলা শয্যায় আশ্রয় হইল। তখন সুবোধচন্দ্রের পত্নী স্বহস্তে লীলাকে ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তখন আর রোগ সারিবার সম্ভাবনা ছিল না। মৃত্যুর আগমনাশায় লীলা আনন্দিতা হইল। সে কেবল মধ্যে মধ্যে লতিকাকে দেখিতে চাহিত।

কবিরাজ সুবোধ বাবুকে বলিলেন যে, "রোগিণী আর বাঁচিবেন না; যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ কোনও বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "চিকিৎসা করুন। কিছু না হয় কি করিবেন?" তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ডাক্তার দেখান হয়; কিন্তু লীলা সে কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নীকে

বিপত্নীক।

বলিল, "আর কয় দিনই বা আছে? কেন আর ডাক্তারের ঔষধ খাইব? কবিরাজের ঔষধেও আর কাজ নাই। পরমায়ু ফুরাইলে কি, দিদি, আমাকে আর রাখিতে পারিবে? লতিকাকে তোমায় দিয়া গেলাম। আমার অপেক্ষাও তুমি তাহার অধিক যত্ন করিবে, আমি জানি। তাঁহার পদসেবা করিতে চলিলাম।"

সুবোধ বাবুর পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন। লীলা বলিল, "কেঁদ না দিদি। আমার জন্য কান্না কেন? আমি ত সুখেই যাইতেছি।"

লীলার বিষাদভরা মুখ হইতে চিন্তা ও বিষাদের ছায়া ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতে লাগিল। সত্য সত্যই লীলা সুখেই মরিতেছিল; সে সত্যই তাহাই ভাবিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মরণান্ধকার।

যে দিন শরৎ লতিকাকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহার পর সে আর সে গৃহে গমন করে নাই। কেন যে সে যায় নাই, তাহার কারণ কি আবার ব্যক্ত করিতে হইবে? লীলার তীর্থভ্রমণে গমনের কথা শরৎ শুনিয়াছিল, তাহার কারণও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল। লীলা তীর্থভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলে শরৎ শুনিয়াছিল যে, লীলা বড় শীর্ণা হইয়াছে।

দুই বাড়ীর মহিলাগণের মধ্যে যাতায়াত ছিল; কিন্তু লীলা আর একদিনও শরতের গৃহে আইসে নাই। শরৎ তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল। লীলার পীড়া যখন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, শরৎ তখন সে সংবাদ পাইল। তাহার পীড়ার সময় শরতের মাতা ও ভ্রাতৃবধূ প্রায়ই লীলাকে দেখিতে যাইতেন; লতিকা "ছেলে"কে আসিতে বলিয়া দিত।

সুবোধ বাবুর সহিত শরতের একদিন সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট শরৎ লীলার পীড়ার আদ্যোপান্ত সকল সংবাদ শুনিল। শুনিয়া শরতের স্থির বিশ্বাস হইল যে, লীলার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। যে জগতে একজনকেও ভালবাসে, সে

বিপত্নীক।

সহজে ইচ্ছা করিয়া মরিতে চাহে না; আর লীলা লতিকাকে অত ভালবাসিয়াও ইচ্ছা করিয়া মরিতেছে! শরৎ বুঝিল, কেন। সুবোধ বাবু বড় চিন্তিত হইয়াছিলেন, শরৎ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সেই দিন হইতে শরৎ বড়ই চিন্তিত হইল।

এ দিকে লীলার পীড়া দিন দিন সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করিতে লাগিল। একাদশ মাসের শেষে লীলা প্রায় উত্থান-শক্তিরহিতা হইয়া পড়িল। দ্বাদশ মাসের প্রথমে একদিন পীড়া অত্যন্ত বাড়িল। কবিরাজ বলিলেন, "আজ শেষ দিন।" লীলা তাহা বুঝিয়াছিল; সে একবার লতিকাকে কাছে আনিতে বলিল। লতিকা আসিলে আপনার শীর্ণ করতল তাহার মস্তকের উপর স্থাপিত করিয়া লীলা কিছুক্ষণ কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর লতিকার মুখ আপনার মুখের কাছে লইয়া লীলা শেষবার কন্যার মুখচুম্বন করিল। লীলার নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল।

লীলা একবার শরৎকে দেখিতে চাহিল। হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে লীলা জয়ী হইয়াছিল।

লীলা তাহাকে ডাকিয়াছে শুনিয়া শরৎ কিছু বিস্মিত হইল। সে সুবোধ বাবুর কাছে যাইলে, তিনি বলিলেন যে, লীলার মৃত্যু নিকট। সুবোধ বাবুর পত্নী শরৎকে লীলার কাছে লইয়া গেলেন। লীলা কষ্টে একবার চাহিল; এই সময়

লতিকা ছুটিয়া শরতের কাছে আসিল; শরৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্থির স্বরে লীলা শরৎকে বলিল, "আমি চলিলাম,—তাঁহার পদসেবা করিতে চলিলাম; লতিকা রহিল। এখানে তাহার অযত্ন হইবে না, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেছি। তবুও একবার আপনাকে বলিয়া যাইতেছি,—লতিকা রহিল।"

লতিকা বলিল, "কাকা, মা কোথায় যাবে?"

অশ্রুপূর্ণনয়নে শরৎ লতিকাকে লইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

লীলা দিদিকে ডাকিল; শাশুড়ীকে ও তাঁহাকে তাহার মস্তকে তাঁহাদের পদধূলি দিতে বলিল।' তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইয়া ক্ষীণস্বরে লীলা বলিল, "লতিকা রহিল।" লীলার জীবন শেষ হইল।

শরৎ মৃত্যুর সময় প্রবোধকে দেখিয়াছে, শরৎ মৃত্যুর সময় প্রভাকে দেখিয়াছে, শরৎ মৃত্যুর সময় লীলাকে দেখিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া শরৎ ডায়েরীতে লিখিল,—

"মৃত্যুর কি অসীম ক্ষমতা! তাহার স্নেহকরস্পর্শে জগতের শোক, তাপ, দুঃখ, দুর্দ্দশা, সকলই দূর হইয়া যায়। এই লীলা জীবনে কি যাতনাই ভোগ করিয়াছে! আজ যে সে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকলেরই অতীত—সে কেবল একবার মৃত্যুর করস্পর্শে।

বিপত্নীক।

"মৃত্যু ত মহানিদ্রা—অনন্ত নিদ্রামাত্র। নিদ্রা পরিমিত সময়ের জন্য আমাদিগকে যে শান্তি দান করে, মৃত্যু অপরিমিত কালের জন্য সেই শান্তি দান করে। মৃত্যু মহা-নিদ্রামাত্র। কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, কি সম্রাটের প্রাসাদে, সর্ব্বত্র তাহার সমান প্রতাপ। কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। সূর্য্যের উদয়কাল জানা যায়, চন্দ্রের অস্তগমনের সময় জানা যায়; কিন্তু মৃত্যুর আগমনের কাল কেহ জানিতে পারে না।

"মৃত্যুর পর কি আছে? সেখানে কি?—অনন্ত সুখ, না অনন্ত দুঃখ? মৃত্যুর পর আর কিছু আছে কি?"

"মৃত্যু অনন্তশক্তিময়—সে মহাশক্তি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন জীবন।

ক্রমে ক্রমে শরৎ তাহার নূতন জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। বসন্তকুমারের ছেলেমেয়েদের লইয়া, যোগেশ বাবুর গৃহে যাইয়া, লতিকার কাছে গিয়া, সাহিত্যসেবা করিয়া, প্রভার কথা ভাবিয়া, শরতের দিন কাটিতে লাগিল। বসন্তকুমারের ছেলেমেয়েরা কাকার সহিত খেলা করিত, কাকার কাছে পড়িত, আর যত আবদার কাকার কাছেই করিত। কাকা তাহাদিগকে খেলানা, খাবার প্রভৃতি কতই দিতেন, এবং তাহাদের জন্য সুন্দর সুন্দর উপকথা ও কবিতা রচনা করিতেন; কাকার কাছে পড়িতে তাহাদের কিছুই কষ্ট বোধ হইত না।

অবসর পাইলেই শরৎ যোগেশ বাবুর গৃহে যাইয়া থাকে। যোগেশ বাবুর হারমোনিয়মের সখ যাইয়া এবার ইংরাজী কাব্যালোচনার সখ আসিয়াছে। যোগেশ বাবুর ইচ্ছা ছিল, এবার একটু গাহিতে শিখেন। সুকুমারী বলিলেন, "দেখ—এত দিন যা করেছ, করেছ। এখন ঘরে একটা ভ্রাতৃবধূ আসিয়াছে, তার কাছে আর বিদ্যার পরিচয়টা নাই দিলে! ও গলায় গান গাহিলে হাসিয়া হাসিয়া আমার বোনটির পেটে

ব্যথা ধরিবে, ছেলেরা ভয় পাইবে, আর পাড়ার লোক গালা-গালি দিবে।” তখন যোগেশ বাবুর হুঁস হইল। তাহার পর যোগেশ বাবু ভাবিয়া স্থির করিলেন, এবার ইংরাজী কাব্যা-লোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। সে বিষয়ে শরতের বিশেষ দক্ষতা, আবশ্যক হইলে তাহার সাহায্যও পাওয়া যাইবে। যোগেশ বাবু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আরম্ভ করেন। শরৎ উত্তর দিল, নম্বর এক অবশ্য সেক্সপিয়ার, নম্বর দুই বায়রণ, নম্বর তিন টেনিসন; তাহার পর তত দিনও যদি যোগেশ বাবুর সখ থাকে, তবে দিনকতক বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদিগের কাব্য আলোচনা করিয়া পুনরায় আরম্ভ করা যাইবে। যোগেশ বাবু সেক্সপিয়ার আরম্ভ করিয়াছেন। শরৎ প্রায়ই তাঁহার কাছে আসিয়া থাকে; সেই জন্য বোধ হয়, এবার তাঁহার সখটা কিছু দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে; কারণ, তাগিদ দিবার লোক আছে।

শরৎ আবার সকলের সহিত পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিতে লাগিল দেখিয়া, সুকুমারী একটু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু শরৎ আর বিবাহ না করায় তিনি দুঃখিতা রহিলেন।

লীলার শেষ কথা শরৎ ভুলে নাই। লীলার মৃত্যুর পর হইতে শরৎ প্রায়ই লতিকাকে দেখিতে যায়। এক এক দিন সে জিদ ধরিলে, সুবোধ বাবু সকালে তাহাকে শরতের কাছে রাখিয়া যায়েন, অপরাহ্নে শরৎ তাহাকে গৃহে রাখিয়া আইসে।

যে দিন শরতের সেই ক্ষুদ্র "মা"টি শরতের কাছে আইসে, সেদিন শরতের আর কোন কাজই হয় না। সে "ছেলের" কোলটি অধিকার করিয়া বসে ; আবার যখন কোল হইতে নামিয়া বসন্তকুমারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে, তখন শরৎকেও তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে হয়। পুস্তকগুলা স্থানচ্যুত করিয়া, কলম কয়টা সারিয়া, ঘরে ছুটাছুটি করিয়া, সে শরতের নিরিবিলি কক্ষটিতে সব গোলমাল করিয়া দেয়। ছেলে মার সব অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করে।

সাহিত্যসেবায় শরৎ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহাতে তাহার কি ? শরৎ তাহার কোনও উপন্যাসের নায়কের সম্ব- হতে যাহা বলিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সেই কথা বল- হবে ; আবার পারে ;—দুইয়ের সহিত দুই যোগ কর, চ- তাহাতে চারের কি ? দুইয়ের সহিত দুই গুণ কর চার হ- হইয়াছে, সে ত ফলমাত্র—সে সে ত ফলমাত্র। তাহার স- ত কেবল তাহার প্রতিভা ও ইচ্ছার ফলমাত্র।

শরৎ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আশা। সেই উদীয়মান তপন যখন তাহার পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হইবে, তখন যে সাহিত্যাম্বর উজ্জ্বল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাহিত্যসেবা এখন শরতের জীবনের একমাত্র সুখ।

যাহাতে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষবিধান হয়, শরৎ সর্ব্বদাই তাহা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল। কেবল

বিপত্নীক।

এক বিষয়ে শরৎ জননী, ভগিনী, ভ্রাতা ও বন্ধুবান্ধবগণ, কাহারও ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিল না। শরৎ আর বিবাহ করিল না,—বিপত্নীকই রহিল।

সম্পূ